বিয়ে-শাদীর প্রয়োজনীয় টিপস

বিয়ের উপহার

শায়খ ইবরাহীম পালনপূরী

অনুবাদ | মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ

“বিবাহের পর সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু হয়। জীবনের নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়। আশ্চর্যজনক বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। কোনো কোনো অবস্থা অন্তরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়, অন্তর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। আবার কোনো কোনো অবস্থা অন্তরে উল্লাসের প্রবল তরঙ্গ বইয়ে আনে, বছরের পর বছর বেঁচে থাকার পরম সাধ মনে জাগ্রত করে”।

“......তুমি মাত্রাতিরিক্ত প্রেম দেখাবে না.... আবার স্ত্রীকে নিজের ক্রীতদাসী বা ঘরের চাকরানি মনে করে তার সাথে খারাপ আচরণও করবে না। স্ত্রীর অন্তরে নিজের ভয় আর ডর বসিয়ে দেওয়ার জন্য চেহারায় রুক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়ে তার সাথে কথা বলবে না।”

“.... ভালোবাসা আর প্রেমের প্রকাশও করতে হবে, নিজের গাম্ভীর্য আর অবস্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আচার-আচরণে প্রেমময়তাও প্রকাশ করতে হবে, সাথে নিজের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।”

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। তিনি আমাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। দ্বীন পালনে সচেষ্ট বানিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

একজন মুসলিমের পুরো জীবনটাই গুরুত্বপূর্ণ। সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের শাসন পালনে বাধ্য। কালিমায় বিশ্বাসী হওয়ার পরই সে নিজের পুরো জীবনকে আল্লাহর বিধানের সামনে ন্যস্ত করে দিতে বাধ্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালনের আন্তরিক সাক্ষ্য এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতিত ব্যক্তি মুসলিমই হতে পারে না।

জীবনের অন্যতম একটা সেক্টর বিয়ের সেক্টর। এ বিষয়ে একজন মুসলিম শরীয়াসম্মত বিশুদ্ধ গাইডের মুখাপেক্ষি হয়। কিন্তু হরেক মানুষ বিভিন্ন জাতের পরামর্শ দিয়ে এ সময়ে মানুষকে পথহারা করে দেয়।-এই সময়ের জন্য সুন্দর আর শরীয়াসম্মত সচেতন পরামর্শের বিকল্প কোনো কিছুই হতে পারে না। বিবাহের এ সময়টার বিভিন্ন পরামর্শ আর মাসআলা নিয়েই শায়খ ইবরাহীম পালনপূরী এই বইটি রচনা করেছেন। তাঁর ভূমিকাতেই তিনি এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

'মাকতাবাতুল আরাফ' নিজেদের সূচনাতেই জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সেক্টর নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু করতে পরম আগ্রহ লালন করে আছে। সেই আগ্রহ থেকেই প্রতিষ্ঠানটির মালিক প্রিয় বন্ধু মাহমূদ হাসান ভাই মূল উর্দূ বইটির পিডিএফ আমাকে দিয়েছিলেন। 'তুহফাতুন নিকাহ' নামক বইটি পড়ে বেশ ভালোই লেগেছে। অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত হলে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরবর্তীতে দ্রুত গতিতে কাজ শেষ হয়। অনুবাদের পর বইয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মনে করে পঞ্চাশের কাছাকাছি টিকা সংযুক্ত করি। এই বইয়ের কোনো টিকা-ই মূল লেখকের না। সব আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিশেষত, মূল লেখক কোনো জায়গাতেই হাদীসের সূত্র উল্লেখ করেননি। সেগুলোর সূত্র যোগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বইয়ের শেষে দুটি প্রবন্ধ পরিশিষ্ট আকারে দেওয়া হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে সুন্দর ও চমৎকার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। নির্ভুল করতে চেয়েছি। তবুও পাঠকের কাছে আকুল মিনতি, কোনো ভুল আপনার নযরে আসলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির ইনবক্সে, সরাসরি বা অন্য কোনো উপায়ে আপনার পরামর্শ আমাদের সামনে আসলে আমরা ইনশাআল্লাহ অত্যন্ত যত্ন ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করবো। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ

সুমিলপাড়া, আদমজী,
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء
والمرسلين خصوصا على سيد الرسل سيدنا محمد الأمين، وعلى
آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد.

সমস্ত প্রশংসা তামাম জগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসূলের উপর। বিশেষত রাসূলগণের সরদার, আমাদের সরদার মুহাম্মাদ আল-আমীনের উপর। তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর সঙ্গীগণের উপর, তাঁর স্ত্রীদের উপর এবং বিচার দিবস পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীদের উপর।

বর্তমানে আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহে এবং তাবলীগী জামাতের মেহনতে দ্বীনের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবণতা বেড়েছে। বিশেষ করে যুব সমাজের ব্যাপক ঝোঁক ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে বন্ধুদের মাধ্যমে জানা গেছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের প্রগাঢ় ভক্ত এবং আশেক। তাদের পুরো যৌবন তারা রাসূল সা. এর সুন্নাত এবং ইসলামের পবিত্র ও সাধারণ পদ্ধতিতে অতিবাহিত করতে চায়।

এই সকল যুবকদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যৌবনের সংরক্ষণ, বিবাহ সংশ্লিষ্ট আচার-রীতি এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াদী। তাই তারা এ বিষয়ক ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে চায়। দ্বীনী আলোচনায় পূর্ণ এই ধরণের বই অধ্যায়ন করতে চায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিবাহ-শাদী, তৎপরবর্তী ভেতরগত আচার-আচরণ এবং বিবাহপূর্ব বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত ভালো কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যদ্দরুণ বিবাহের মুহূর্তে তাদের জন্য অন্যদের বইপত্র দেখা লাগে- যেগুলোতে চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীলতা এবং চরিত্র বিনাশী বিষয়বস্তুর ছড়াছড়ি থাকে।

পরিচিত শুভানুধ্যায়ীগণ বারবার বলছিলেন, যদি এ বিষয়ে দ্বীনি রুচি-অভিরুচি ধারণকারী কোনো বই যুবকদের সামনে আসতো, তাহলে অনেক ভালো হতো; সে বইয়ের উপস্থিতিতে তাদের জন্য অন্যদের বই দেখার প্রয়োজনই হতো না। বরং তারা নিজেদের সুন্দর জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ অনুযায়ী সাজাতে পারতো।

তাদের এই চাহিদা অনেক মূল্যবাণ এবং উপযোগী ছিলো। তাদের আবদার রক্ষা করাও আমার জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো। কিন্তু শুরুতে মনে কিছুটা টানাপড়েন ছিলো। দোদুল্যমান ছিলো। সাথে সাথে এই সংক্রান্ত আলোচনা তৈরি করাটাও বড় কঠিন বিষয় ছিলো। বিশেষত, যেহেতু এ সংশ্লিষ্ট ভালো গ্রন্থ সহজলভ্য নয়। তথাপি আমার এই অনুভূতি অবশ্যই ছিলো যে, যদিও এটা একটা অভিনব বিষয়, তবুও এমন বইয়ের প্রয়োজন অনেক বেশি। তাছাড়া, রাসূল সা. এর সুন্নাহ যিন্দা করার যে সুখবর দেওয়া হয়েছে, হতে পারে আমি সেই সুসংবাদের ভাগিদার হয়ে যাবো- যা উভয় জাহানে আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। এমন আশাও আমার মধ্যে প্রচণ্ড রকমের ছিলো। তাই আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের উপর ভরসা করেছি। ফলে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এবং অনেক চেষ্টা-সাধনার পর এই গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছে।

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, তিনি যেন আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন। সমস্ত মানুষের জন্য এটাকে উপকারী বানান। আমীন।

মুহাম্মাদ ইবরাহীম পালনপূরী

উস্তাদুল হাদীস, মাদরাসায়ে আরাবিয়া তা'লীমুল ইসলাম, গুজরাট। (ভারত)

যৌবনের সূচনা

ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী ছেলে সন্তানের যৌবন শুরু হওয়ার বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। যেমন,

ক. স্বপ্নদোষ হওয়া।
খ. কোনো নারীকে গর্ববতী বানিয়ে ফেলা।
গ. জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হওয়া।

যদি এর কোনও একটি নিদর্শনও পাওয়া না যায়, তাহলে ছেলের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলে ইসলামী শরীয়ায় তাকে বালেগ গণ্য করা হয়।

* নারীদের বালেগা হওয়ারও বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। যেমন,

ক. (মিনস/পিরিয়ড) হায়য বা ঋতুস্রাব হওয়া।
খ. স্বপ্নদোষ হওয়া।[১]
গ. গর্বধারণ করা।
ঘ. জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হওয়া।

যদি এর কোনো একটি নিদর্শনও পাওয়া না যায়, তাহলে ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে বালেগা গণ্য করা হয়[২]।

---

(১) নারীদেরও স্বপ্নদোষ হতে পারে। এক হাদীসে দেখা যায়, উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, মহিলার স্বপ্নদোষ হলে তার উপর গোসল কি ফরয হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি সে বীর্য দেখতে পায়, তাহলে গোসল ফরয হবে'। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ১৩০)

বৃটিশ পত্রিকা ডেইলি মেইলের বরাতে কায়রো থেকে প্রকাশিত অনলাইন পত্রিকা 'আল-ইয়াওমুস সাবে'র ২০১৫ সনের ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, ৩৭ পার্সেন্ট নারীর স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। আমেরিকান এক দল গবেষক ১১০০০ পুরুষ-মহিলার ওপর রিসার্চ করে এই তথ্য প্রকাশ করেছিলো।

২. আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন: ৬/১৫৩।

বালেগ হওয়ার পর ছেলে-মেয়ে উভয়েই শরীয়ার বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়িত্বশীল হয়ে যায়। নামায-রোযা সহ অন্যান্য বিধান তাদের উপর ফরয হয়ে যায়। যদি গাফলাত বা অজ্ঞতার দরুন বিধান পালনে তাদের কোনো ত্রুটি হয়, তাহলে সেই বিধানের কাযা পালন করতে হয় এবং ত্রুটির দায় পুষিয়ে নিতে হয়। বালেগ হওয়ার পূর্বে বাচ্চা তাদের পিতা-মাতার অনুগামী ছিলো। শরীয়ার পক্ষ হতে তাদের উপর কোনো বিধান ছিলো না। কিন্তু বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সেই শিশুটি স্বতন্ত্র পুরুষ বা নারী গণ্য হয়ে যায়। শরীয়াতের যাবতীয় বিধান তাদের উপর নির্ধারিত হয়ে যায়।

যৌবনের উন্মাদনা

আরবী ভাষায় একটা সারগর্ভ প্রবাদ আছে।

الشباب شعبة من الجنون

অর্থাৎ 'যৌবন পাগলামীর অংশ বিশেষ"। এটাই বাস্তবতা। একজন শিশু যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আকর্ষণ, হরেক কিসিমের উন্মাদনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। চারপাশের সোসাইটি এবং সঙ্গী-সাথীদের পরিবেশের প্রভাবে তার মধ্যে সুপ্ত সে সকল ঝোঁক আর প্রবণতায় উত্থান ঘটতে থাকে। যৌবনের সীমানায় পদার্পণ করা নবীনদের জন্য এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবর্তন।

যৌবনের সঠিক সংরক্ষণ

বাচ্চার যৌবনের সূচনা থেকেই মা-বাবার জন্য তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। অসৎ বন্ধু এবং সঙ্গীদের থেকে তাদেরকে যথেষ্ট দূরে রাখার ভরপুর চেষ্টা করবে। সিনেমা, থিয়েটার, ফিল্ম, নাচ-গান, নোংরা উপন্যাস, উলঙ্গ ফটো এবং চরিত্র বিনাশী বিষয় সমূহ থেকে তাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষা করবে। নারীদের জমজমাট স্থানে আসা-যাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে সংমিশ্রণ থেকে তাদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখবে।

নব যুবকদের জন্যও এই সকল বিষয় থেকে আশ্চর্যরকমের সতর্কতা কাম্য। নচেত যৌবনের সূচনাতেই যদি বিপথে অগ্রগামী হয়ে বসে, তাহলে পরবর্তীতে সঠিক পথে ফিরে আসা পাহাড় তুলনায় অধিক ভারী হয়ে যাবে। ইযযত-সম্মান তো যাবেই, সাথে সুস্থতা এবং সক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ারও প্রচণ্ড আশংকা রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালের এই মুহূর্তটা এতই কঠিন যে, এ সময়ের কোনো বিচ্যুতি ভবিষ্যতের পুরো জীবনকে বরবাদ এবং ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

মূলত, মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই দু'টি শক্তি এবং সক্ষমতা থাকে।

১. আত্মীক কামনা-বাসনার শক্তি।
২. মুহাব্বাত আর ভালোবাসার সক্ষমতা।

যৌবনের শুরুতেই এই দুই সক্ষমতার আন্দোলন শুরু হয়। উপরে নিষেধ করা বিষয় সমূহ এই সক্ষমতায় আরো জোয়ার ও জাগরণ তৈরি করে। অবস্থা এত বেগতিক হয়ে দাঁড়ায় যে, বিবেকও নিজের কাজে অবহেলা শুরু করে দেয়। তাই এ সময়ে মানুষ তড়িঘড়ি ভুল পাত্রে নিজের ভালোবাসা আর মুহাব্বাতের সম্পর্ক স্থাপন করে সেখানে নিজের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে থাকে। অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে যদি ভুল স্থানে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় অথবা মানসিকভাবে সে খুব বেশি দুঃসাহসী এবং লজ্জাহীন না হয়ে থাকে, তাহলে নিজের চাহিদা পূরণের স্বার্থে ভুল এবং অস্বাভাবিক পথ খুঁজতে থাকবে। সমকামিতা, মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন সহ এ জাতীয় নোংরা আর কদর্য অভ্যাস আয়ত্ব করে নিজের দ্বীন এবং দুনিয়া বরবাদ করবে। শারীরিক সুস্থতা হারিয়ে যাবে। বরং অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যত জীবনে বিয়ে করার উপযুক্তই থাকবে না। শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো ধীরে ধীরে তার জীবন আলোহীন হয়ে পড়বে। কখনো এই ধরণের অশ্লীল অভ্যাসের কারণে গনোরিয়া[৩], প্রমেহের মতো ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে।

এই সকল কারণেই ১৫ বছর থেকে ২০/২২ বছর পর্যন্ত সময়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত। এই সময়ে সে ভালো এবং উপকারী গ্রন্থসমূহ পড়বে। নেককারদের সভায় আসা-যাওয়া করবে। এ সময়ে যদি সে নিজের যৌবন এবং সুস্থতার সংরক্ষণ করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতের পুরো জীবন সুস্থতা আর আনন্দের সঙ্গে কাটবে। পক্ষান্তরে যদি এই সময়ে অসৎ সাহচর্য জুটে যায়, মন্দ অভ্যাস তাকে পেয়ে বসে, তাহলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তার ভুক্তভোগী হওয়ার এবং তার জীবন আজীর্ণ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

---

(৩) গনোরিয়া বা প্রমেহ একটি যৌনবাহিত রোগ। অ্যালবার্ট নাইসার নামক এক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১৮৭৯ সালে এ রোগের জীবানুটি আবিষ্কার করেন। এই রোগের কারণে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব ঘটতে পারে। ২০১০ সালে ৯০০ জন গনোরিয়ার রোগী মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯০ সালে এই রোগে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ছিলো ১১০০ জন। সূত্র: বাংলা উইকিপিডিয়া, গনোরিয়া। ড. মো. হুমায়ুন কবীর, দৈনিক ইনকিলাব- ২৮ মে ২০১২।

যৌবন সংরক্ষণের উপায়

যৌবনের সূচনাতেই তা সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. বাচ্চা যখন বুঝ সম্পন্ন এবং সমজদার হয়ে যাবে – যা সাধারণত ৭-৮ বছরে হয়ে থাকে – তখন থেকেই তাকে ভিন্ন বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস করাতে হবে। ভাই-বোন এবং অন্যান্য মাহরামদের সঙ্গেও তাকে ঘুমাতে দিবে না; কারণ শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ[৪]। তাছাড়া এতে করে যে কোনো মুহূর্তে চারিত্রিক পদস্খলনের শিকার হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। নন-মাহরামদের থেকে তো আরো বেশি সযত্ন দুরত্ব বজায় রাখবে।

২. উঠতি বয়সিদের জন্য একেবারে নির্জনতা ও একাকিত্বে থাকা এবং ঘুমানোও উচিত না। অর্থাৎ তার রুমে অন্য কেউ থাকবে না, এমন যেন না হয়; কারণ এতে তার মন-মস্তিস্কে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে, যেগুলো অনেক ত্রুটির জন্ম দেয়। তাই সম্পূর্ণ ভীন্ন পৃথক রুমে ঘুমাবে না। বরং সবার সামনেই সে ভিন্ন বিছানায় ঘুমাবে।

৩. যৌবনের সূচনাতে শরীরের পরিচ্ছন্নতা, বিশেষত লজ্জাস্থানের পরিচ্ছন্নতা এবং নাভীর নিচের লোমের পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় ময়লা জমে চুলকানী এবং ত্বকের রোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো চুলকানোর কারণে আনন্দ এবং উত্তেজনা তৈরি হয়ে ক্ষতিকর প্রভাব প্রকাশ পেতে পারে।

---

(৪) এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের সন্তান যখন ৭ বছরের হয়ে যায়, তখন তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। যখন তারা ১০ বছরের হয়ে যায়, তখন নামাযের জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা ভিন্ন করে দাও"। (মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা, হাদীস নং: ৩৫০১)

এই হাদীস থেকে জানা যায়, সন্তান ১০ বছরের হয়ে গেলে তাদেরকে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করানো উচিত। অবশ্য যদি ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে একসাথে শয়ন করতে কোনো সমস্যা নেই। "আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল্ল": ২/৫৩৫।

উল্লেখ্য, প্রতি সপ্তাহে একবার, বিশেষত জুমার দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে। নখ, মোচ ঠিক করবে। বগল এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করে গোসল করবে। বগল এবং নাভীর নিচের লোম প্রতি সপ্তাহে একবার পরিস্কার করতে না পারলে অন্তত ১৫-২০ দিনে একবার করবে। এগুলো পরিস্কারের সর্বোচ্চ সীমা ৪০ দিন। অপরিস্কার অবস্থায় ৪০ দিন অতিবাহিত হলে গুনাহগার হবে[৩]।

৪. যৌবনে পদার্পণ করা বাচ্চাদেরকে কোনো ভালো কাজে লিপ্ত রাখবে। কর্মহীন থাকা বহুত খারাপ। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন- "কর্মহীনতা চূড়ান্ত রকমের নোংরা লিপ্ততা; কর্মহীনতার দরুন খুব শীঘ্রই উদ্ভ্রান্ততা সৃষ্টি হয়ে যায়"।

৫. অসৎ বন্ধু, খারাপ সঙ্গী এবং কলুষিত সাহচর্য থেকে দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। অসৎ সাহচর্য দ্বারা যেখানে ভালো ব্যক্তিরাই নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে নবযুবকরা নষ্ট হওয়া তো নিতান্তই স্বাভাবিক।

৬. নবেল, উপন্যাস, প্রেমাসক্তিমূলক কিসসা-কাহিনী এবং ভালোবাসা মূলক বইপত্রের পাঠ মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে। অসৎ কামনা-বাসনার দিকে মানুষকে প্রবাহিত করে। ফলে মানুষ ভুল রাস্তায় চলে যায়। তাই এ সমস্ত কিছু পাঠ থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক।

৭. সিনেমা, থিয়েটার এবং ফিল্ম দেখা, গানবাজনা শোনা, যুবতি মেয়েদের সাথে দৃষ্টি আদান-প্রদান করা এবং কু-দৃষ্টি করা এসব-ই নোংরা। এগুলো ধ্বংসাত্মক বিষ থেকে কোনো দিকেই নিম্নমানের না। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এগুলো চূড়ান্তভাবে পরিহার করা উচিত। যুবকদের জন্য তো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা এগুলো আবশ্যকভাবে বর্জন করবে।

---

(৩) সাহাবি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মোচ কাটা, নখ ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম মুণ্ডনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন ৪০ দিনের অধিক এগুলো রেখে না দেই'। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৮)
হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ রদ্দুল মুহতারে (৬/৪০৬) বলা হয়েছে, ৪০ দিনের অধিক সময় রেখে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমি।

বিয়ে কখন করাতে হবে?

বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের কল্পনা-জল্পনা এবং বিবাহের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পরপরই যৌবনের সূচনাতেই বিয়ে করিয়ে দেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ যৌবনের সূচনাতেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি আর পরিপক্কতা তৈরি হয়। এই বয়সেই বিবাহ করিয়ে দিলে স্নায়ু আর গ্রন্থিগুলো দৃঢ় হওয়ার পূর্বেই শরীরের মূল ধাতু (বীর্য) নিঃশেষ হতে থাকবে। নব বিবাহিত এই তরুণ নিজের অজ্ঞতার কারণে এবং ইচ্ছা শক্তির উপর কন্ট্রোল না থাকার দরুন সতর্কও থাকবে না। ফলে শরীরের মূল স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে যাবে।

মূলত, মানুষের খাবারগুলো কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে শুক্রাণু তৈরি হয়। এই শুক্রাণুর মধ্যেই আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির শক্তি রেখেছেন। যদি নিজের বিবেক আর বোধশক্তি না থাকার দরুন এত মূল্যবান বীর্য ব্যয় হতে থাকে, সাথে শরীরের স্নায়ুগুলোও দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে সকল খাবার শুক্রানুর ভাণ্ডারের দিকেই ছুটবে। ফলে রক্তের সাহায্যে প্রস্তুত হওয়া অন্যান্য স্নায়ু আর গ্রন্থিগুলো বিনষ্ট হতে শুরু করবে।

এ জন্যই যৌবনে পদার্পণ করা কিশোরদের জন্য নিজেদের সুস্থতা আর শক্তির সংরক্ষণ করা আবশ্যক। অসৎ উপায়ে শুক্রাণুর এই সক্ষমতা নষ্ট করা অনুচিত। এভাবে নিজের স্বাস্থ্য আর সুস্থতা রক্ষা করে চললে কিছুদিন পর যখন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হবে, তখন সে এমন সুখ, আনন্দ আর মজা পাবে, যা এক কথায় অকল্পনীয়।

অবশ্য জোয়ান হওয়ার পরক্ষণেই কোনো জায়গায় বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে ভালো। এতে করে ভালোবাসা আর প্রাকৃতিক কামনা-বাসনার জন্য একটা স্থান চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কল্পনার জগত এদিক-সেদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরঘুর করা থেকে পরিত্রান পাবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিবাহ হওয়ার আগ পর্যন্ত শরীয়াতের দৃষ্টিতে সেই মেয়ে ঐ ছেলের জন্য আজনবী এবং অপরিচিত-ই থাকবে; কাবিন হয়ে গেলেও। তাই বিবাহ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই মেয়ের সঙ্গে কথা বলা, তাকে স্পর্শ করা এবং তাকে দেখা, সব না-জায়েয এবং হারাম।

বিয়ের জন্য পাত্রি ঠিক করা

ছেলে জোয়ান হওয়ার পর যখন তার বিয়ের জন্য কনে ঠিক করা হবে, তখন প্রথমেই তার মতামত জেনে নেওয়া উত্তম। যদি সে নিজে না বলে, তাহলে তার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে তার অন্তরের ঝোঁক আর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে জেনে নিবে। কোনোভাবে তার আন্তরিক টান আর ঝোঁকের বিষয় জানা গেলে, ছেলের পরিবার সেই মেয়ে, তার পরিবারবর্গ এবং তাদের দ্বীনদারী সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে। তাদের দু'জনের মধ্যে মিল-মুহাব্বাত থাকবে কী না, সেটাও তারা ভেবে নিবে। যদি সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাহলে সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করে দিবে।

উল্লেখ্য, ছেলের মতের বিপরিতে বা তার অজ্ঞাতেই কোনো জায়গায় বিয়ে ঠিক করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে না; কারণ পুরো জীবন-ই তো ছেলের জন্য সেই মেয়ের সঙ্গেই থাকতে হবে। যদি তার মতের বিপরিতে অথবা তার অজ্ঞাতেই বিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে অমিল তৈরি হওয়া এবং সম্পর্ক টেকসই হওয়ার পরিবর্তে ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা প্রবল। তাই ছেলের জীবনের কল্যাণের বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই তার সন্তুষ্টিতে বিয়ের সম্পর্ক ঠিক করা উচিত।

অবশ্য যদি ছেলের বাবা-মা ধারণা করে যে, ছেলে স্বীয় অশিষ্টতা এবং স্বাধীনচেতা মানসিকতার ফান্দে পড়ে তাদের পছন্দের ভালো জায়গা ছেড়ে কোনো খারাপ স্থানে নিজের বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্ধত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তারা তাকে বুঝাবে। নিজেদের পছন্দ করা সম্পর্কের উপকারিতা এবং ভালো দিকগুলো ছেলের মস্তিস্কে বসাবে। এটা তাদের চারিত্রিক অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। এভাবে হলে, সম্পর্কটাও হাসি-খুশিতে বাস্তবায়ন হবে, মা-বাবার অন্তরও পরিচ্ছন্ন থাকবে, মনের মধ্যে কোনো জঞ্জালও থাকবে না।[১]

---

(১) মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময়ও এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। তার মতের সম্পূর্ণ বিপরিতে গিয়ে কিছু করবে না। অনেক এলাকাতে মেয়েদের মতের বিপরিতে গিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার যে প্রচলন আছে, সেটা অনুচিত । এতে বৈবাহিক সম্পর্ক অশান্তিপূর্ণ হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। বিয়ের এই সম্পর্ক মেয়ে এবং তার পরিবার, সবার সন্তুষ্টিতেই হওয়া কাম্য। সাহাবি উমর রা. বলেন, "তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে বিয়ে দিতে ইচ্ছা করলে, অমনি যে কোনো কুৎসিত লোকের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। অথচ তোমাদের মতো তাদেরও পছন্দ আছে। অর্থাৎ কুৎসিত লোকের সাথে বিয়ে দেওয়া

পাত্রি নির্বাচনে করণীয়

বিয়ের জন্য কনে ঠিক করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম।

১. কনের বয়স ছেলের বয়স থেকে কিছু কম হওয়া। বেশি না হওয়া। দু'ই-চার বছর কম হলেও হবে।

২. নতুন বিবাহিতদের জন্য কুমারী মেয়েই বেশি উপযোগী। এতে তাদের মধ্যে খুব বেশি ভালোবাসা এবং সামঞ্জস্য তৈরি হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এটাই বলেছেন।

৩. সম্বন্ধ চূড়ান্ত করার পূর্বে ছেলে-মেয়ে উভয়ে একে অপরকে এক নজর দেখে নেওয়া। সাহাবি মুগিরা ইবনু শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "তুমি তাকে দেখে নাও, কেননা তা তোমাদের মাঝে স্থায়ী ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"[৭]।

হলে সেক্ষেত্রে সে তাই অপছন্দ করে, যা পুরুষ অপছন্দ করে। আর তখন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়"। (অর্থাৎ স্বামীর অবাধ্য হয়ে উঠে)। (মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, হাদীস নং: ১০৩৩৯)

বরং শরীয়তের সীমা রেখায় মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনা করত মেয়ে ও অভিভাবক উভয়ের সন্তুষ্টিতে একাজটি সম্পন্ন করা উচিত।

সূত্র: "বিয়ে ও তালাকের শরয়ী রূপরেখা" পৃষ্ঠা: ১২০-১২৩

(৭) সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৮৭।

বিবাহের পূর্বে বিবাহ ইচ্ছুক ছেলের জন্য পাত্রি দেখা জায়েয। ক্ষেত্র বিশেষ মুস্তাহাব। ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই দেখতে চাইলে দেখতে পারে। না দেখে বিবাহ করতে চাইলে সেটাও করতে পারে। প্রস্তাব করে আনুষ্ঠানিকভাবেও পাত্রি দেখার সুযোগ আছে। মুগীরা ইবনু শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব করে পাত্র দেখেছেন মর্মে হাদীস আছে। অবশ্য কোনো কোনো আলিম প্রস্তাব করে পাত্রি দেখা না-জায়েযও বলেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা রক্ষা করা হয় না। অভিভাবকদের কেউ পাত্র-পাত্রিকে ছেড়ে দেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পার্ক, ক্লাব, সমুদ্র সৈকত কিংবা নিরিবিলি স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে। কেউ আবার নির্জনে দু'জনকে কথা বলার সুযোগ করে দেন। মুসলিমদের ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অবৈধ। আর যারা শরীয়া পালনে বদ্ধপরিকর, তাদের নিকটেও পাত্রি দেখানোর বিষয়টি নানাবিধ বিকৃতির শিকার। যার ফলে এতে শরয়ী নীতিমালার স্পষ্ট লংঘন হয়ে থাকে।

পাত্রি দেখার শরয়ী কয়েকটি নীতিমালা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বিয়ের উদ্দেশ্যে কেবল পাত্রই পাত্রিকে দেখতে পারবে। অন্য কোনো পুরুষ পাত্রিকে দেখতে পারবে না। পাত্রের বাবা, দাদা, মামা বা চাচা কারো জন্যই এটা জায়েয নেই। তাদের জন্য সম্পূর্ণ না-জায়েয ও হারাম। আমাদের সমাজে পাত্রের বাবা, বড় ভাই ঘটা করে যে পাত্রি দেখে, সেটা জায়েয হওয়ার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এটাতো না-জায়েয হচ্ছেই, তদুপরি আয়োজন করে গুনাহ করার ধৃষ্টতাও দেখানো হয়। গুনাহ তো গুনাহ অবশ্যই। কিন্তু তাই বলে এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে! আল্লাহ হেফাজত করেন মুসলমানদেরকে।

২. পাত্র পাত্রির শুধু হাত কব্জি পর্যন্ত, পা টাখনু পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল আবরণ ছাড়া দেখতে পারবে। এর বেশি কোনো অংশ সে আবরণ ছাড়া দেখতে পারবে না। কনের মাথার চুল পাত্রকে দেখানোর যে প্রচলন আছে, সেটা ধার্মিক মুসলমানদের প্রচলন না। বাকী কাপড়ের উপর দিয়ে অন্যান্য অঙ্গ যতক্ষণ খুশি দেখতে পারবে।

৩. পাত্র-পাত্রি পরস্পর কথা বলবে। একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারবে। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে। কিন্তু কোনো অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না। হাতও স্পর্শ করার সুযোগ আল্লাহভীরু মুসলমানদের জন্য নেই।

৪. পাত্রির কোনো মাহরাম বালেগ পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া কোনো নির্জন স্থানে পাত্র-পাত্রি একত্রিত হতে পারবে না। নির্জনে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ। একই রুমে পাত্র-পাত্রি একত্রিত হবে। বালেগ মাহরাম পুরুষ যিনি থাকবেন, তিনি একটু দূরে বসে শুধু দেখবেন। কথা শোনার চেষ্টা করবেন না। অবশ্য তিনি চোখের সামনেই রাখবেন।

৫. পাত্র-পাত্রি উভয়েই স্বাভাবিক সাজসজ্জা করতে পারবে। তবে এমন সাজসজ্জা করতে পারবে না, যার দ্বারা শরীরের প্রকৃত রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং অপর পক্ষ প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছেলে বা মেয়ে কারো জন্যই মেকআপ করে বাস্তবিক রূপ গোপন করার সুযোগ নেই। এগুলো ধোঁকা হওয়ার কারণে না-জায়িয।

৬. কনে দেখে তাকে কোনো গিফট দিতে পারবে। বই-পুস্তক, টাকা-পয়সা বা গহনা-আংটি দিতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনোভাবেই কনের শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ করতে পারবে না।

একে অপরকে দেখে নেওয়ার হাদীসে বর্ণিত রহস্যটি ব্যতিত আরো দু'টি রহস্য আছে।

ক. বিয়ের জন্য পাত্রি ঠিক করার এই মুহূর্তগুলোতে মানুষ কখনো অন্যের মুখে শুনে শুনে নিজের মন-মস্তিস্কে পাত্রির চমৎকার সুন্দর, কমনীয় একটি আকৃতি অঙ্কন করে নেয়। বিয়ের পর সাক্ষাৎ হলে যখন সেই সৌন্দর্য আর কমনীয়তা না পায়, তখনই মনোমালিন্য তৈরি হয়ে যায়। কখনো ঝগড়াও বেঁধে যায়।

খ. সবমানুষের পছন্দ একরকম হয় না। কথায় আছে না "মন যার যার, পছন্দ তার তার"। যার কাছে পাত্র পাত্রির গুণাগুণ শুনেছে, সেটা হয়তো তার পছন্দ। কিন্তু তার পছন্দ আর পাত্রের পছন্দ তো এক নাও হতে পারে। তাই দেখে নিজের পছন্দের পর-ই বিয়ে করা উত্তম।

৪. পাত্রি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার ধার্মিকতা এবং সচ্চরিত্রতা দেখতে হবে। গৃহস্থ বিষয় সম্পর্কে তার জানাশোনার খোঁজও নিতে হবে।

মূলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নির্দেশনা আমাদেরকে পাত্রি নির্বাচনের উত্তম পন্থা বাতলানোর কাজটি করেছে। তিনি বলেন, "চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাধারণত নারীদেরকে বিয়ে করা হয়। ক. সৌন্দর্য দেখে। খ. ধন-সম্পদ দেখে। গ. উচ্চ বংশ দেখে। ঘ. ধার্মিকতা দেখে। এই শেষটার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে বিয়ে করে, সে-ই সফল[৮]।

একটু ভাবুন। প্রথম তিনটি বিষয় বাস্তবেই মানুষের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে।

প্রথমত, রূপ-সৌন্দর্য অনেক ভালো এবং চিত্তাকর্ষক। কিন্তু প্রিয় যুবক, এটা খুব দ্রুতই হারিয়ে যাবে। আল্লাহ না করুক, যদি গুটিবসন্তের সামান্যও আক্রমণ

বিস্তারিত দেখুন, "বিয়ে ও তালাকের শরয়ী রূপরেখা" (৫৪-৬০) (সংক্ষেপিত ও সংযোজিত)। উস্তাদ মুফতী শাব্বীর আহমাদ সাহেবের অনুবাদ ও সংযোজনে মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত।

(৮) সহীহুল বুখারীর ৬০৯০ এবং সহীহ মুসলিমের ১৪৬৬ নং হাদীসের মর্ম এটি।

হয় বা কোনো আঘাত লাগে অথবা অসুস্থতায় পড়ে, তাহলে সমস্ত শোভা আর সৌন্দর্য পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। তাছাড়া প্রাথমিক এই সৌন্দর্য কয়েক বছরের মেহমান মাত্র। গুটি কয়েক বছর অতিবাহিত হলে, সন্তান জন্মদানের ধারাবাহিকতা শুরু হলে, এই সৌন্দর্য এমনিতেই শেষ হতে শুরু করবে।

এ কথাও মাথায় রাখবে, তুমি রূপ-সৌন্দর্য তালাশ করে রূপ-সৌন্দর্য যখন কারো পাবে, তখন তার মধ্যে রূপের অহংকারও পেতে পারো। তাই আগ থেকেই চিন্তা করে নিবে, রূপের অহমিকা সহ্য করতে পারবে কী না?

রূপবতী এই পাত্রির জন্য তোমার মতো আরো কতক প্রার্থী থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তোমার সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে তারা আবার তোমার প্রাণের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে কী না? সেটাও চিন্তার বিষয়।

তুমি যেমন রূপের কামুক, সেও তো এমন রূপময় কারো প্রত্যাশী। তাই নিজের ব্যাপারে একটু ভেবে নিও, তুমি তার উপযোগী কী না? নচেত এমন হবে, তুমি তাকে খুব চাও, কিন্তু সে তোমাকে ঘৃণা করে! তুমি তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সে তোমার থেকে পলায়নের কৌশল খুঁজছে হন্যে হয়ে! এমন সম্পর্কে আনন্দই বা কীসের!!! এ জন্যই দ্বীনদারি রেখে শুধু রূপের পিছনে পড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। অবশ্য, কিছুটা চিত্তাকর্ষক আর মনোহরী হলে তো অনেক ভালো[*]।

(*) পাত্রি নির্বাচনের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পাত্রির রূপসী ও সুন্দরী হওয়া। এই রূপ-লাবণ্যও কাম্য। কেননা পুরুষের চরিত্র রক্ষায় স্ত্রীর রূপের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। হাদীসে যে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে এবং রূপ-লাবণ্যের জন্য বিয়ে না করতে বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিমুখ করা বা তার অবমূল্যায়ন করা নয়, ববং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনদারী না থাকা সত্ত্বেও শুধু রূপ-লাবণ্যের জন্য বিয়ে করতে বারণ করা। কারণ অনেক সময় শুধু রূপ-লাবণ্যই বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ রূপ-লাবণ্যের কারণে দ্বীনদারীর বিষয়টি অনেকের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়। পরিণামে স্ত্রীর কারণে স্বামীর দ্বীনদারী বিনষ্ট হয়। আর যদি দ্বীনদারীর পাশাপাশি রূপ-লাবণ্যের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়,

দ্বিতীয়ত, কিছু মানুষ এমন আছে, বিয়ের পাত্রি খোঁজার ক্ষেত্রে যাদের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের সীমাহীন গুরুত্ব আর মহত্ত্ব থাকে। তারা সম্পদশালী কোনো মেয়েকে কেবল এজন্যই চায় যেন, তাদের ঘরের মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করে, তাদের ঘর সুন্দরভাবে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু হে প্রিয়, রূপ-সৌন্দর্য থেকে তো আরো দ্রুত এটা নিঃশেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যার ধনি সকালবেলা নিঃস্ব হতে দেখা যায়। তাছাড়া তুমি হয়ত ধোঁকায় পড়ে মনে করছো, পাত্রি সম্পদশালী। কিন্তু না। সে সম্পদশালী না। তার পরিবার সম্পদশালী। তাদের সম্পদ কী সেই পাত্রির সঙ্গে এসে যাবে? যদি এসেও যায়, তোমার পুরুষালী আত্মসম্মান কী স্বামী আর পুরুষ হয়ে স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর লালা ফেলার জন্য প্রস্তুত হবে?!

পাত্রি যদি সম্পদশালী পরিবারের হয়, তার প্রয়োজনীয়তা আর চাহিদা তো সেই অনুপাতেই হবে। সেই সব প্রয়োজনীয়তা আর চাহিদা পূরণের সামর্থ্য কী আছে তোমার? হাতির খাবার তো হাতির মতোই হবে, তোমার শুকনো, শুস্ক রুটিতে সে তৃপ্ত হবে কীভাবে? ফলে প্রতিদিনই গঞ্জনা আর নিন্দা শুনতে হবে। অসন্তুষ্টি আর মানিয়ে নেওয়াই প্রতিদিনের ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়াবে। এ ক্ষেত্রে সে তোমার কৃতজ্ঞ স্ত্রী হবে কী করে? বৈবাহিক জীবনে তুমি হয়ে যাবে অনুগামী আর সে প্রভাব বিস্তারকারী। যদি এ সকল অপদস্থতা তুমি মানতে পারো, তাহলে বিয়ে করে দেখ, সে তোমার অনুগত হয় নাকী তোমার উপর ফয়সালাকারী? জ্ঞানীরা যথার্থই বলেছেন, 'সম্পদের দিক দিয়ে স্ত্রী স্বামী থেকে নিচু স্তরের হওয়া উচিত'। এমন হলে স্ত্রী কৃতজ্ঞ হবে এবং নিআমাতের শোকর করবে[১০]।

তাহলে সে ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না। বরং দ্বীনদারীর পাশাপাশি এ রূপ-লাবণ্য অধিক কল্যাণ বয়ে আনবে। (বিয়ে ও তালাকের শরয়ী রূপরেখা, পৃষ্ঠা: ৪৯-৫০।

(১০) সম্পদশালী পরিবারের পাত্রিদের ক্ষেত্রে এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বাকী এগুলো সবজায়গাতেই হবে, এমন নয়।

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন "কোনে পুরুষ যদি বিয়ের সময় জিজ্ঞেস করে মেয়ের সম্পদ কী আছে? তাহলে জেনে রাখ সে নিশ্চয় চোর"। ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন: ৬/১২৬।

তৃতীয়ত, কিছু মানুষ বিবাহের ক্ষেত্রে উঁচু বংশ এবং নামি-দামি পরিবারের পাত্রি খোঁজ করে। যেন বউ দ্বারা সম্মানিত হতে পারে এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে পারে। এ সকল মানুষদের স্মরণ রাখা উচিত, উঁচু-নিচু বংশ হওয়ার বিষয়টি অনির্ধারিত। অর্থাৎ নির্ধারিত এক রীতিতে সব স্থানে সমানভাবে গৃহিত নয়। এটা শরীয়াতের দৃষ্টিতেও অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া সৌন্দর্য আর সম্পত্তির বিষয়ে উপরে যে সকল আশঙ্কা উল্লেখ করা হয়েছে, বংশের ক্ষেত্রেও সে সকল আশঙ্কা প্রমাণিত।

মোটকথা, দ্বীনদারি না থাকলে সৌন্দর্য, সম্পত্তি বা বংশ আর ফ্যামিলি স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণযোগ্য না। দ্বীনদারি না থাকলে তো পাত্রির মূল সম্পদ পবিত্রতা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতা নিয়েই আশঙ্কা থাকে। এজন্যই পাত্রি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার দ্বীনদারিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট। যদি পাত্রি নামায-রোযার পাবন্দ হয়, ভালো চরিত্র বিশিষ্ট হয়, গৃহস্থ বিষয়ে অবগত হয়, সাথে তার ফ্যামিলিও দ্বীন পালনকারী হয়, তাহলে এর থেকে বড় আর কোন নিআমত হতে পারে না। এই পাত্রি এমন, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষের জন্য পছন্দ করেছেন।

পাত্রির ধার্মিকতার সাথে আরো কিছু বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। যেমন, তার আক্বীদা-বিশ্বাস কী? মানসিক আকর্ষণ আর প্রবণতা কেমন? ঈমানী প্রেরণা আছে কী নেই? এগুলো না দেখলে আল্লাহ না করুক যদি আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এবং পর্দাহীনতা আর নির্লজ্জতা তার মধ্যে সুপ্ত থাকে, তাহলে তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের নিয়েই সে পথচ্যুত হবে।

৫. সুস্থ হওয়া। ধ্বংসাত্মক কোনো অসুস্থতা বা স্থায়ী কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত না হওয়া।

৬. নিজের বংশের হলে ভালো। এতে আত্মীয়তা রক্ষাও সুন্দরভাবে পালিত হবে।

৭. পাত্র ও পাত্রি উভয়ের রুচি-অভিরুচি প্রায় কাছাকাছির হওয়া। এমন যেন না হয় যে, একজন খুব ফ্যাশনপ্রিয় আর অন্যজন সাদাসিধে জীবন যাপনকারী। এমনটি হলে বৈবাহিক জীবন আনন্দঘন হওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

৮. কিছুটা শিক্ষিত হওয়া। দ্বীনী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া। একেবারে মূর্খ না হওয়া। ছেলে এবং মেয়ে উভয়পক্ষের স্বজনদের জন্যই এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

পাত্রি নির্বাচনের পর যখন বিয়ের অঙ্গিকার প্রদানের (এনগেজমেন্টের) ইচ্ছা হবে, তখন ওযু-গোসল করে চার রাকাত নামায পড়বে। দুই রাকাত সলাতুল হাজত বা প্রয়োজন পূরণের নামায আর দুই রাকাত ইস্তিখারার নামায। হাদীসে বর্ণিত এই দুই নামাযের দুআগুলো পড়বে। এরপর আল্লাহর কাছে দুআ করবে জীবনের উত্তম সঙ্গী প্রাপ্তির জন্য এবং বিবাহের সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য।

উল্লেখ্য, বিয়ের বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বসহ দুআ করলে ইনশাআল্লাহ অনেক বেশি উপকার হবে।

এনগেজমেন্ট হওয়া / এনগেজ করা

বিবাহের এনগেজ করার নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি নেই। এটি পাত্র ও পাত্রির পরিবারের পারস্পরিক একটি অঙ্গিকার । (অর্থাৎ বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া)

অভিভাবকরা চাইলে মুখের কথায় করে নিতে পারে। চাইলে লিখেও করে নিতে পারে। অথবা পরিচিত কারো মাধ্যমে করে নিতে পারে। এভাবে সম্বন্ধ চূড়ান্ত হওয়া এক প্রকারের প্রতিশ্রুতি। যতদূর সম্ভব এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। না করলে ওয়াদা খেলাফ হবে। আর কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের অপছন্দনীয়[১১]।

বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা

সম্বন্ধ চূড়ান্ত হয়ে গেলে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে বিবাহের একটা তারিখ চূড়ান্ত করে নিবে। বিবাহেব তারিখ নির্ধারণে যে সকল কু-সংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে, সেসবই অনর্থক এবং ভুল। সেগুলো থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা চাই। উভয়ের সম্মতিতে বিবাহের যে তারিখ চূড়ান্ত হবে, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে সে দিনেই সাধাসিধেভাবে বিবাহ করে নিবে।

---

(১১) আমাদের সমাজে বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত করাটাকে এনগেজমেন্ট বলা হয়। এনগেজ করা বলা হয়। শরীয়ার দৃষ্টিতে এর মানে হলো, উভয়ের পরিবারের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি। কোনো কু-সংস্কারের আশ্রয় না নিলে এতে কোনো সমস্যা নেই। জায়েয হবে। এটা যেহেতু একটা প্রতিশ্রুতি, তাই সাধ্যানুযায়ী এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত। প্রতিশ্রুতির সময়ে পাত্রিকে কোনো আংটি বা চেইন দেয়া যেতে পারে। যদি এমনিতেই ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে, তাহলে বিয়ে না হলে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি গিফট বা উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে ফিরিয়ে নেওয়া, হাদিয়া দিয়ে হাদিয়া ফিরিয়ে নেওয়ার নামান্তর। হাদীসে যাকে বমি করে আবার গিলে ফেলার সদৃশ বলা হয়েছে। অবশ্য, যদি কনে পক্ষের সন্তুষ্টিতে দেওয়া হয়, তাহলে ফিরিয়ে নিতে পারবে। উল্লেখ্য, এনগেজের সময় যে অলংকার দেওয়া হয়, তা সাধারণত এমনিতেই ব্যবহার অর্থাৎ আরিয়াত হিসেবে দেওয়া হয়। যার মালিক থাকে ছেলে পক্ষ।

বিবাহের আদাবসমূহ

বিবাহের অনেকগুলো আদব রয়েছে।

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো, নিয়ত ভালো রাখা। দুনিয়াবী সকল কাজেই নিয়ত ভালো হলে, সওয়াব পাওয়া যায়। আর বিবাহ তো সুন্নাত। তাই বিবাহে নিয়ত যতো ভালো হবে, ততো সওয়াব পাওয়া যাবে। এই হিসেবে বলা যায়, বিবাহ একটি মাত্র আমল। কিন্তু এতে যতো নিয়ত করা হবে, ততো বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। বিবাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়তগুলো করা যেতে পারে।

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পালনের নিয়ত করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত"[১২]। আর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

খ. বিবাহের মাধ্যমে গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার নিয়ত করা।

গ. বিবাহের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোলে রাখার নিয়ত করা। অন্তরের আকর্ষণ এদিক-সেদিক যাওয়া থেকে এবং কু-দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণের নিয়ত করা।

ঘ. নেককার সন্তানের জন্মদানের নিয়ত করা। মা-বাবা হিসেবে তাদের নেক দুআ পাওয়ার নিয়ত করা।

ঙ. পরিবার এবং সন্তান-সন্ততির জিম্মাদার ব্যক্তির ইবাদতের সওয়াব অবিবাহিত ব্যক্তির ইবাদাতের সওয়াব থেকে বেশি হয়ে থাকে। সেই অধিক সওয়াবের নিয়ত করা।

---

(১২) সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং: ১৮৫১।

উল্লেখ্য, হাদীসে যে সুন্নাতের কথা বর্ণিত হয়, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য ফিকহের পরিভাষার সুন্নাত না -যা করলে সওয়াব, এক-দু'বার না করলে গুনাহ হয় না-। বরং এই সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি, যা কখনো ওয়াজিব হয়, কখনো ফরয আবার কখনো মুস্তাহাব হয়। এমনই কথা বিয়ের ক্ষেত্রে। বিয়ে কখনো কারো জন্য ফরয, কারো জন্য ওয়াজিব, কারো জন্য সুন্নাত। আবার কারো জন্য না-জায়িযও হয়ে থাকে।

ঙ. সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বৃদ্ধি করার নিয়ত করা-যেই উম্মাতের আধিক্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব করবেন।

ছ. আল্লাহর পথের দাঈ সন্তানের নিয়ত করা। যারা উম্মাতকে অনেক উপকৃত করবে এবং পিতা-মাতাকেও উপকৃত করবে।

জ. সন্তান শিশুবস্থায় মারা গেলে তারা পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে। তাই সন্তানের নিয়ত করা।

এভাবে বিবাহ দ্বারা যতো ভালো নিয়ত করবে, তার সওয়াব তত বেশি হবে এবং বিবাহের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়ার বরকত অর্জন হবে। ভাবনা-চিন্তা ব্যতিত এমনিতেই বিবাহ করা বা চাহিদা পূরণ এবং দুনিয়াবী আনন্দ ভোগ করার নিমিত্তে বিবাহের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা মু'মিন এবং মুসলমানের শান না। বরং এ ক্ষেত্রে তো বিবাহ শুধু প্রাণীকেন্দ্রিক একটি ব্যস্ততা হিসেবে পরিগণিত হবে।

তাছাড়া বিয়ে-শাদির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য হলো, প্রশান্তি আর সুখের যিন্দেগী যাপন করা। এই হিকমত আর লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জিত হবে, যখন বিবাহ ইচ্ছুকের মন উপরোক্ত লাভ আর উপকারিতার প্রতি ঝুঁকবে এবং ভালোবাসা আর মুহাব্বাতের যে মূল পদার্থ আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন, সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় ইচ্ছা করবে।

২. বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া এবং ঘোষণা দিয়ে হওয়া। রাসূল সা. বলেছেন,

"তোমরা বিবাহের ঘোষণা দাও, যদিও দফ বাজিয়ে হয়"[১৩]।

গোপনে বিবাহ না করা। যিনা আর বিবাহের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। অবৈধ যিনা হয় গোপনে আর বিবাহ হয় প্রকাশ্যে এবং সকলের সামনে।

৩. বিবাহ মসজিদে হওয়া এবং কোনো নামাযের পর হওয়া। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পর বা আসরের নামাযের পর হওয়া অধিক উত্তম। এতে স্থান

---

(১৩) সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৮৯।

এবং সময় উভয়ের বরকত-ই অর্জিত হবে। বিবাহের অনুষ্ঠানে যতো বেশি আলেম এবং নেককার লোক উপস্থিত হবে, বিবাহ তত উত্তম হবে; এতে বিবাহে তাদের দুআ পাওয়া যাবে আর তাদের দুআর বরকতে বৈবাহিক জীবন রহমত ও বরকতময় হয়ে ওঠবে।

৪. বিবাহ কোনো বড় আলেম বা নেক ও ভালো মানুষ দিয়ে পড়ানো। প্রথমে খুতবা পড়ে তিনি প্রস্তাব ও গ্রহণ করাবেন। কবুল করানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, বিবাহকারী যেন পুরো বাক্য 'আমি কবুল করলাম' বলেন। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বন্ধু-বান্ধবগণ মুবারকবাদ জানাবেন, সুসংবাদ জ্ঞাপন করবেন। মুবারকবাদ জানানোর জন্য হাদীসে একটি দুআ বর্ণিত হয়েছে।

بَارَكَ اللهُ فِيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا الطَّيِّبَ

"আল্লাহ তোমাদের উভয়ের মধ্যে বরকত দান করেন। কল্যাণের সাথে তোমাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে দেন এবং তোমাদের থেকে উত্তম সন্তান সৃষ্টি করেন"[১৪]।

৫. বিবাহ পড়ানোর পর খেজুর ছড়ানো বা খেজুর বণ্টন করা মুস্তাহাব। অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে, মসজিদে যেন শোরগোল ও হৈ চৈ না হয় এবং মসজিদের সম্মান কোনোভাবেই যেন বিনষ্ট না হয়[১৫]।

---

(১৪) সাহাবি আবু হুরাইরা রা. বলেন, কেউ বিবাহ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ

"আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দান করেন। তোমার উপর বরকত দান করেন এবং তোমাদের মধ্যে কল্যাণের মাধ্যমে মিল তৈরি করেন"। সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৯১।

(১৫) বিবাহের আকদে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে খেজুর, বাদাম, মিষ্টি ইত্যাদি বণ্টন করা জায়েয। আমাদের দেশে অনেকে বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানোকে সুন্নাত মনে করে। সুন্নাত মনে করে, এ কাজ করা ঠিক নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে খেজুর ছিটানোর বিষয় প্রমাণিত নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস যয়ীফ। তাই সুন্নাত নয়, বাকী জায়েয। ছিটিয়েও দেওয়া যেতে পারে, হাতে হাতে বণ্টনও করা যেতে পারে। হাকীমুল উম্মাত

৬. বিবাহের মোহর খুব বেশি না হওয়া, মধ্যম পর্যায়ের হওয়া। বিবাহের অন্যান্য কাজেও অপচয় এবং অতিরিক্ত ব্যয় না হওয়া। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সর্বাধিক বরকতপূর্ণ বিবাহ হলো, সবচেয়ে কম ব্যয়ের বিবাহ"[১১]। তাই হাঙ্গামা যত কম হবে, খরচ যত কম হবে এবং বিবাহ যত সাদাসিধে হবে, ইনশাআল্লাহ ততো বেশি বরকতময় হবে।

এমনিভাবে পাত্রির সাথে সরঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি কৃত্রিমতা করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে কী সরঞ্জাম দিয়েছিলেন? দুইটা ইয়েমেনী চাদর, চারটা নরম বিছানা, রুপার তৈরি দুইটা হাতের অলংকার, দুইটা বালিশ, একটা কম্বল, একটা পেয়ালা, আটা পেসার একটা চাক্কি, একটা মশক বা থলে আর পানি রাখার একটা পাত্র। কোনো কোনো বর্ণনায় একটা খাটের কথাও আছে।

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, 'পাত্রির সাথে সরঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. সামান্য পরিমাণ দিবে। সাধ্যের অতিরিক্ত দেওয়ার চিন্তা করবে না।

খ. প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দিবে। যে জিনিষের বাস্তবেই প্রয়োজন আছে, সেটাই দেওয়া উচিত।

গ. প্রচার করবে না। এটা তো কেবল নিজের সন্তানের প্রতি দয়া আর আন্তরিকতা। অন্য মানুষদেরকে দেখানোর কী প্রয়োজন আছে? হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে সরঞ্জামাদি দেওয়ার যে বর্ণনা আছে, তাতে এই তিনটি শর্তই পাওয়া যায়।

আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহ বর্তমান যামানায় হাতে হাতে বণ্টন করাকেই উত্তম বলেছেন। বিশেষত যখন বিবাহের আকদ মসজিদে হবে, তখন হাতে হাতেই দেওয়া উচিৎ। কেননা, ছিটিয়ে দিলে মসজিদে হৈ হুল্লোড় ও শোরগোল হয়, যা মসজিদের আদব পরিপন্থি। সূত্র: বিয়ে ও তালাকের শরয়ী রূপরেখা, পৃষ্ঠা: ১১৮-১১৯। ইসলামী শাদী, পৃষ্ঠা: ১২৫।

(১১) মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং: ২৪৫২৯। মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা, হাদীস নং: ১৬৩৮৪।

মেয়ে উঠিয়ে দেওয়ার ইসলামী পদ্ধতি

বিবাহের পর কনেকে বরের নিকট পাঠানোকে উঠিয়ে দেওয়া বলে। এই উঠিয়ে দেওয়াও একেবারে সাদাসিধে হওয়া উচিত। নিজের ঘরের কোনো নারী, বা সেবিকা অথবা বরপক্ষ থেকে আগত কোনো নারীর সাথে কনেকে পাঠিয়ে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতিমাকে সেবিকা উম্মু আইমানের সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাঠিয়েছেন। ইসলামী শরীয়াতে পাত্রি উঠিয়ে দেওয়াব বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই। কোনো কু-সংস্কার বা প্রচলন রক্ষা করাও উচিত না। মেয়ের সাথে যে সকল সরঞ্জাম দিবে সেগুলো উঠিয়ে নেওয়ার সময় দেওয়াও আবশ্যক না। পরেও দেওয়া যেতে পারে।

ফুলসজ্জা (প্রথম রাত) কীভাবে যাপন করবে?

বিবাহ এবং উঠিয়ে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হলে, স্বামী অবশ্যই তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসবে। এখানে আসার পর তাদের মধ্যে নির্জনতা এবং একাগ্রতা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে কিছু আদাব, কিছু মূলনীতি এবং কিছু কথা স্মরণ রাখা উচিত।

১. দুলহা ও দুলহান উভয়ে উঠিয়ে নেওয়ার আগেরদিন সময় করে কিছুটা বিশ্রাম করে নিবে বিশ্রাম না করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে থাকবে না। কিছুটা বিশ্রাম করে নিলে উভয়ের সাক্ষাতের কাঙ্খিত মুহূর্তে শরীরে উদ্যমতা থাকবে এবং মনের মধ্যে প্রশস্ততা থাকবে। মানসিকতা তরতাজা থাকবে।

২. প্রফুল্লতা আর আনন্দের বিভিন্ন উপকরণ যদি সহজে ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ফুলসজ্জার রাতের জন্য ব্যবস্থা করে নিবে। যেমন, কিছু ফলফ্রুট। কিছুটা মিষ্টান্ন এবং রুমের কিছুটা সাজসজ্জা।

উল্লেখ্য, কোথাও কোথাও প্রথম রাত কাটানোর রুম সাজানোর জন্য অনেক অতিরঞ্জন করা হয়। রুম সাজানোর জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। এটা অপচয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়। এতে গুনাহ হয়ে থাকে। আর অপচয় করা তো শয়তানের কাজ। (অপচয়কারীকে কুরআনে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।)

৩. যদি বিয়ের নগদ মোহর প্রদানের প্রচলন না থাকে, তাহলে তার রুচি-অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে কিছু জিনিষ তাকে উপহার দিবে। কিছু দেওয়া ব্যতিতই তার থেকে উপকৃত হওয়া পুরুষালী আত্মসম্মান বহির্ভূত আচরণ।

৪. প্রথম সাক্ষাতে কথা-বার্তার পূর্বে স্ত্রীকে “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে সালাম করবে। এরপর তার কপাল এবং চুলের উপর হাত রেখে নিম্মোক্ত দুআ পড়বে।

اللهم إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

> অর্থাৎ “হে আল্লাহ, এই স্ত্রীর কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর আপনি এই স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, তা আমি আপনার কাছে কামনা করছি। এই স্ত্রীর অনিষ্ট এবং যে অনিষ্টের উপর একে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি”[১৭]।

এ চারটি ব্যতিত আরো কিছু আদাব বা করণীয় রয়েছে। যেমন, প্রথমে ওযু করবে। এরপর দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়বে। আল্লাহর কাছে দুআ করবে কল্যাণ ও বরকতের। পারস্পরিক সামঞ্জস্য, মুহাব্বাত আর ভালোবাসার। আন্তরিকতা আর পরিচ্ছন্নতার সাথে এই সম্পর্কের স্থায়ীত্বের। নেককার সন্তান প্রাপ্তির জন্যও আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

সালাফদের জীবনিতে পাওয়া যায়, তারা দু-চার রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। এরপর স্থান ও সময় অনুযায়ী নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর সামনে দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা, অস্থায়ীত্ব এবং ধন-সম্পদের মূল্যহীনতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতেন; যাতে স্ত্রীর অন্তর থেকে সম্পদের মুহাব্বাত হ্রাস পায় এবং তার মধ্যে দ্বীনী মানসিকতা তৈরি হয়।

---

(১৭) সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০, জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৯১। ইমাম নববী রহ. এই দুআ পড়ার পূর্বে আরেকটি দুআ পড়তে বলেছেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে “*বা-রাকাল্লহু লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিন্না ফী সাহিবিহি*” (আল্লাহ উভয়ের জন্য তার সঙ্গীর মধ্যে বরকত দান করেন)। আল-আযকার, পৃষ্ঠা: ২৬৬।

স্ত্রীর কাছে বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলবে। বিবাহের পূর্বের সম্পূর্ণ অপরিচিতি আর বিবাহের পরের একেবারে আন্তরিকতা, মুহাব্বাত, অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা আলোচনা করবে। মমতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা আর মুহাব্বাতপূর্ণ বিভিন্ন কথাবার্তা বলবে।

অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিবাহের পূর্বে স্বামী ও স্ত্রী দু'জন সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো। তাদের মধ্যে কোনো ধরণের সম্পর্ক ছিলো না। বিবাহের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতম এই সম্পর্ক স্থাপনের পর মুহূর্তেই তো আর লজ্জাবতী সেই স্ত্রী অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠতে পারবে না। পুরোপুরি সামনেও আসতে পারবে না। তাই বিবাহের সর্বশেষ লক্ষ্য স্ত্রী সঙ্গম বা শারীরিক সম্পর্কে তাড়াহুড়া করা কোনো ভাবেই উচিত না। বরং এক-দুই রাত শুধু তার সাথে আন্তরিকতা আর অন্তরঙ্গতার কথা বলে কাটিয়ে দিবে। এরপর ধীরে ধীরে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনার আর নৈকট্য দেওয়ার চেষ্টা করবে। শারীরিক সম্পর্কের জন্য তো পুরো জীবনই বাকী আছে। এত তাড়াহুড়া করার কী আছে? কেউ তো আর নিয়ে যাচ্ছে না। বরং অন্তরঙ্গতা ব্যতিত প্রথমেই সহবাসের জন্য হামলে পড়ার মধ্যে একাধিক সমস্যার আশংকা আছে।

১. স্ত্রীর মনে এটা গেঁথে যাবে যে, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবলই শারীরিক চাহিদা পূরণ। আর কিছু না।

২. স্বভাবগতভাবেই নারীরা লাজুক থাকে। তাই তারা এত দ্রুত সহবাসের কামুক আর আগ্রহী হয়ে ওঠতে পারে না। যদি আগ্রহী দ্রুত হয়েও যায়, তবুও তাদের চাহিদায় এত দ্রুত উত্থান সৃষ্টি হয় না। ফলে প্রথমেই স্বামীর টাইম ওভার হয়ে যাওয়ার দরুন তার চাহিদা অপূর্ণাঙ্গ থাকবে। সে কোনো আনন্দই উপভোগ করবে না। এতে দুরত্ব তৈরি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩. প্রথমবার সহবাসের দরুন নারীদের কুমারিত্বের পর্দা বা পাতলা আবরণ ফেটে যায়। স্ত্রী অন্তরঙ্গ না হয়ে থাকলে বা তার মধ্যে প্রবৃত্তির কামনা পুরোপুরি তৈরি না হলে কুমারিত্বের এই পর্দা ফেটে যাওয়ার সীমাহীন কষ্ট সে অত্যন্ত কঠিনভাবে অনুভব করবে, যা তার কাছে রুহ বের হয়ে যাওয়ার মতো লাগবে। এতে তার মনে স্বামীর প্রতি এক ধরণের অনিহা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

স্ত্রীর সাথে আচরণের মূলনীতি

স্ত্রীকে অন্তরঙ্গ আর ঐকান্তিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখতে হবে, বিবাহের পর সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু হয়। জীবনের নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়। এ সময় আশ্চর্যজনক আর অবাককর বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। কোনো কোনো অবস্থা অন্তরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়, অন্তর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। আবার কোনো কোনো অবস্থা অন্তরে উল্লাসের প্রবল তরঙ্গ বইয়ে আনে, বছরের পর বছর বেঁচে থাকার পরম সাধ মনে জাগ্রত করে। এ সকল অবস্থায় নিজেকে কন্ট্রোল করা অনেক বেশি প্রয়োজন। নিজেকে গুছিয়ে রাখা আবশ্যক। মাত্রাতিরিক্ত প্রেম আর অন্তরঙ্গতার অবস্থা দেখাবে না; এতে স্ত্রী স্বামীকে নিজের সেবক আর চাকর ভাবতে শুরু করবে। ফলে সে নিজের কথা মানাতে আর দাবী-দাওয়া সমর্থন করাতে শুরু করবে। আবার স্ত্রীকে নিজের ক্রীতদাসী বা ঘরের চাকরানি মনে করে তার সাথে খারাপ আচরণও করবে না। স্ত্রীর অন্তরে নিজের ভয় আর ডর বসিয়ে দেওয়ার জন্য চেহারায় রুক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়ে তার সাথে কথা বলবে না। এতে স্ত্রীর মনে ভয় আর গাম্ভীর্য তৈবি হয় না, বরং তার অন্তরে স্বামীর বিপক্ষে বিদ্বেষ আর ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, স্ত্রী চারিত্রিক পবিত্রতার রাণী হয়ে ঘরে এসেছে। স্বভাবগতভাবেই সে তোমার মাহবূবা এবং প্রিয়তমা। তোমার জীবনসঙ্গিনী। তোমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজের সহযোগী ও সহকারী। তাই ভালোবাসা, আন্তরিকতা আর প্রেমের প্রকাশও করতে হবে, নিজের গাম্ভীর্য আর অবস্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আচার-আচরণে প্রেমময়তাও প্রকাশ করতে হবে, সাথে সাথে নিজের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

দুটি ভুল ধারণা

১. কিছু কিছু মানুষ বাসর রাতকে ক্বদরের রাতের মতো মর্যাদাপূর্ণ মনে করে। ক্বদরের রাতের যত সম্মান, বাসর রাতেরও তেমন। ক্বদরের রাতে যেমন দুআ কবুল হয়, বাসর রাতেও তেমন কবুল হয়। বরং কেউ তো বাসর রাতকে ক্বদরের রাত থেকেও বেশি মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। শরীয়তে এটার কোনো অস্তিত্ব নেই।

২. কেউ কেউ মনে করে, মহরের টাকা সম্পূর্ণ পবিত্র। এটাও প্রসিদ্ধ আছে, অসুস্থ হলে মহরের টাকা দিয়ে চিকিৎসা করালে দ্রুত সুস্থতা আসে। এটাতো সম্পূর্ণ সত্য যে, মহরের টাকা স্ত্রীর জন্য ঠিক তেমন হালাল ও বৈধ, যেমন অন্যান্য বৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ। কিন্তু মহরের টাকা দিয়ে চিকিৎসা করালে দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়, এটা কোথাও নেই।

সহবাসের আদব

সহবাস মানুষের স্বভাবজাত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, যেটা ব্যতিত সহজ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা কঠিন। বরং অসম্ভব প্রায়। স্বভাবজাত এই চাহিদা পূরণের টান আল্লাহ তাআলা কেবল মানুষকেই দেননি। বরং সকল প্রাণীর মধ্যেই দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত মানুষেব স্বভাবজাত এই চাহিদা পূরণের জন্য কিছু আদাব ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে; নচেত মানুষ আর চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যই বা হবে কী করে? সহবাসের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য যদি যেভাবেই হোক শুধু প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ-ই হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ আর প্রাণীতে পার্থক্য কোথায়?! এই জন্যই সহবাসের আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা শরয়ী দাবী হওয়ার পাশাপাশি মানবিক অধিকারও বটে। সহবাসের প্রতি মানবিক সম্মতি থাকার পাশাপাশি ইসলাম এটার শরয়ী কিছু অবস্থানও নির্ধারণ করেছে। এর অনেক ফযীলাতও বর্ণনা করেছে; যাতে একজন মুসলমানের কামনা-বাসনা পূরণের এই কাজে সওয়াবের ব্যবস্থাও থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> “নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও সদকা। এতে সওয়াব পাওয়া যায়”.

সাহাবিগণ বললেন, হে রাসূল, এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে স্বভাবজাত চাহিদা পূরণ করছে, এতেও তার সওয়াব হবে!? রাসূল সা. পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, "যদি সে কোনো ভুল জায়গায় নিজের চাহিদা পূরণ করতো, তাহলে কী গুনাহ্ হতো?" তারা বললেন, অবশ্যই হতো। এবার রাসূল সা. বললেন,

> "গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য যখন হালাল স্থানে নিজের চাহিদা পূরণ করে, তাহলেও অবশ্যই সওয়াব হবে"[১৮]।

এই হাদীসে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, বান্দার উপর আল্লাহর কত কত নিয়ামত।

এবার সহবাস করার কিছু আদব উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. প্রথমে স্ত্রীকে আন্তরিকতা, মমতা, ভালোবাসা আর চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা অন্তরঙ্গ করবে। এমন সকল পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যার দ্বারা স্ত্রীও সহবাসের জন্য আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

পরামর্শঃ স্ত্রীকে সহবাসে আকৃষ্ট করার এবং তার মধ্যের কামনাকে জাগিয়ে তোলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নারীদের রুচি-প্রকৃতি আর অবস্থাভেদে যা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন, ভালোবাসা আর প্রেমের কথাবার্তা বলা, চুম্বন-মর্দন করা, জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মতে, নারীর কামভাব বেশি জাগ্রত হয় তার স্তন মর্দনের দ্বারা। এমনিভাবে স্তনের বোটা আস্তে আস্তে মর্দন এবং চোষণের দ্বারা তার মধ্যে কামভাব দ্রুত উথলে ওঠে।

উল্লেখ্য, স্তন চোষণের দ্বারা যদি দুধ মুখের মধ্যে চলে আসে, তাহলে তা ফেলে দিবে; কারণ স্বামীর জন্য স্ত্রীর দুধ পান করা হারাম। বরং কোনো কোনো আলিম তো স্ত্রীর দুধ পানের কারণে বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার কথাও বলেন। যদিও আমাদের মাযহাব অনুসারে এর কারণে বিবাহ ভাঙ্গে না। কিন্তু হারাম অবশ্যই।

---

(১৮) সহীহু মুসলিম, হাদীস নং: ১০০৬। আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বড় একটি হাদীসের শেষ টুকরো এটি।

চিকিৎসকগণ বলেন, কামভাবের কেন্দ্রবিন্দু নারীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে থাকে। যখন যে অঙ্গে থাকে, তখন সেই অঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা তার মধ্যে কামভাব উথলে ওঠে। কখন কোন অঙ্গে আছে তা বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা অনুমিত হতে পারে।

স্ত্রীর কামভাব পূর্ণভাবে উথলে ওঠলে বিভিন্ন আচার-আচরণে সে তা স্বামীকে জানিয়ে দেয়। যেমন, স্বামীর নিকট আসতে শুরু করে, স্বামীর শরীরে হাত বুলাতে থাকে, চোখে-মুখে মাতলামি শুরু করে, স্বামীকে চুম্বন করতে থাকে, শরীর টান করে শরীরের স্পর্শকাতর সৌন্দর্যগুলো স্বামীকে দেখাতে শুরু করে ইত্যাদি।

কিন্তু যতক্ষণ স্ত্রীর মধ্যে কামভাব পূর্ণভাবে উথলে না ওঠবে, ততক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গম করা শুরু করবে না। বরং নিজের জযবা আর প্রবল তাড়না নিজের কন্ট্রোলে রাখবে।

কন্ট্রোলে রাখার একটা পদ্ধতি হলো সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজের মন-মস্তিস্ক, চিন্তা-ভাবনাকে সহবাসের আনন্দ আর মজার অনুভব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। মন-মস্তিস্ক অন্য কিছুতে ব্যস্ত বাখা।

সৃষ্টিগতভাবেই মহিলাদের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, তাই স্বামীকে তার স্বভাব-প্রকৃতি বুঝে অগ্রসর হতে হবে। কখনো যদি কোনো কারণে স্ত্রী শারীরিক মিলনের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া কোনোভাবেই উচিত না।

২. যখন মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকে, তখনই কেবল সঙ্গম করা উচিত। একেবারে ক্ষুধার্ত থাকাবস্থায় এবং ভরা পেটে সঙ্গম করবে না। পেশাব-পায়খানার বেগ রেখেও না। প্রচণ্ড ঘুম চোখেও না এবং মাথায় হাজারটা পেরেশানি আর দুঃশ্চিন্তা নিয়েও সঙ্গম করবে না।

৩. সঙ্গমের সময় সাধ্যানুযায়ী গোপনীয়তা এবং পর্দার ব্যবস্থা রাখা উচিত। তাই এমন স্থানে করবে, যেখানে অন্য কেউ না থাকে। অবুঝ বাচ্চার উপস্থিতিতেও না। (অবশ্য বাচ্চা যদি ঘুমন্ত থাকে, তাহলে করা যেতে পারে)। কোনো প্রাণীর উপস্থিতিতেও করবে না। যদি সঙ্গম করার রুমে কুরআন বা ধর্মীয় কোনো বই থাকে, তাহলে কাপড় দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিবে। সঙ্গমের সময় একেবারেও উলঙ্গ হওয়াও ঠিক না। বরং প্রয়োজন অনুপাতে কাপড় সরাবে। আর বাদ বাকী অবশিষ্ট স্থান কোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে নিবে।

৪. কিবলামুখী হয়ে সঙ্গম করবে না। এতে কিবলার অসম্মান হয়।

৫. সঙ্গম সহ যাবতীয় সাক্ষাতের পূর্বে মিসওয়াক, ব্রাশ ইত্যাদি দিয়ে মুখ পরিস্কার করে নিবে। দাঁত-মুখ পরিস্কার রাখা এমনিতেও তো সুন্নাত। কিন্তু এ সকল আনন্দঘন মুহূর্তে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা আর সুগন্ধির প্রতি আরো বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। এতে করে মুখের দুর্গন্ধে নিজ সখির কষ্ট হবে না। সুগন্ধি জাতীয় কোনো খাবার খেয়ে নেওয়া বা মুখে রাখলে তো আরো ভালো।

৬. সঙ্গম করার পূর্বেই নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নিবে।

بِسْمِ اللهِ. اَللهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

> অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে যে সন্তান দিবেন, তাকেও শয়তান থেকে বাঁচান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই দুআ পড়ার পর শুরু করা সঙ্গমের দ্বারা আল্লাহ যদি কোনো সন্তান দেন, তাহলে শয়তান সেই সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না[১১]।

---

(১১) সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ১৪১। সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং: ১৪৩৪। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

'শয়তান সেই বাচ্চার ক্ষতি করতে পারবে না' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আলিমগণ কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর আর চমৎকার একটি উদ্দেশ্য কতক আলিম বলেছেন যে, ঐ বাচ্চার ঈমান হেফাজতে থাকবে। শয়তান তাকে ঈমান থেকে দূরে সরাতে পারবে না। আল্লাহু আকবার, কতো বড় নিয়ামত এটি। একটি মাত্র দুআর বরকতে বাচ্চার ঈমান সংরক্ষিত থাকবে।

সতর খোলার পূর্বেই এই দুআ পড়ে নেওয়া উচিত। সতর খোলার পর যদি স্মরণ হয় , তাহলে মনে মনে পড়বে। মুখে উচ্চারণ করে পড়বে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উক্ত দুআটি পড়বে।

৭. সঙ্গম চলাকালীন কথা বলা অনুচিত। সে সময় অন্য কোনো নারীর সাথে সঙ্গম করার কল্পনা করাও অনুচিত। অন্য কারো কল্পনা করলে, সেটা যিনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

অবশ্য, স্বামীর যদি দ্রুত বীর্যপাত হওয়ার রোগ থাকে, তাহলে সঙ্গম শুরু করার পর সঙ্গমের দিকে মনোযোগ রাখবে না। এতে দ্রুত স্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সঙ্গম করার সময় মন-মস্তিস্কে সঙ্গম করার কথা রাখবে না। বরং অন্য কিছুর দিকে মনোযোগ রাখবে। এতে দ্রুত বীর্যপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৮. স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে অন্যজনের পুরো শরীর দেখতে পারে। কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিত দেখা উচিত না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর দেখিনি। তিনিও কখনো আমার সতর দেখেননি।

৯. সঙ্গম করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যতক্ষণ পুরোপুরি পরিতৃপ্ত আর শান্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামী বিচ্ছিন্ন হবে না। শরীরের উপরই থাকবে। স্ত্রী পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বে তার থেকে সরে যাওয়া সুস্থতার জন্যও ক্ষতিকর। স্ত্রীর পরিতৃপ্ত হওয়ার একটা নিদর্শন আছে। সঙ্গম চলাকালীন যে শক্তভাবে সে ধরে রেখেছিলো, পরিতৃপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সেই আঁকড়ে থাকা আর থাকে না। তার শরীরে কিছুটা ছেড়ে দেওয়া ভাব চলে আসে।

সাধারণত স্বামীর দ্রুত সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীর হয় না। কারণ স্ত্রীরা সাধারণত একটু ভীত আর সন্ত্রস্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং তাদের যৌনাঙ্গও থাকে গোপনীয়। ফলে তাদের বীর্যপাতে কিছুটা সময় লাগে। বিপরিতে স্বামীরা সাধারণত গরম প্রকৃতি আর কঠিন মেজাযের হয়ে থাকে এবং তাদের যৌনাঙ্গও প্রকাশ্য থাকে। ফলে তাদের বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়।

যে কারণেই হোক, যদি স্বামী স্ত্রীর আগেই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তার বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় অবস্থায়ই থাকা উচিত। সরে যাওয়া বা নেমে যাওয়া অনুচিত। যদি স্ত্রীর পরিতৃপ্তির পূর্বেই স্বামী সরে যায়, তাহলে এতে স্ত্রীর অন্তর প্রশান্ত না হওয়ার কারণে মুহাব্বাতের পরিবর্তে স্বামীর প্রতি তার বিতৃষ্ণা ভাব সৃষ্টি হয়। সর্বদা যদি এমনই চলতে তাকে, তাহলে স্ত্রী নিজের আরামের জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজে নেওয়ারও আশঙ্কা আছে।

একটি নোংরা অভ্যাস

চূড়ান্ত পর্যায়ের নোংরা, কুৎসিত আর ঘৃণ্য একটা বিষয়, যেটা লিখতে মন সায় দেয় না। কিন্তু আধুনিক ফ্যাশন পুঁজারীদের মধ্যে যেটার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে বিধায় লিখতে হয় সেটার অশ্লীলতা আর ঘৃণ্যতা বুঝাতে হয়। কতক স্বামী স্বীয় যৌনাঙ্গ স্ত্রীর মুখে প্রবেশ করায় আর স্ত্রী সেটা মুখে নিয়ে চুষে। এটা চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল আর নোংরা কাজ। ইসলামী শরীয়াতে এটার কোনো সুযোগ নেই। একইভাবে কতক স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গে চুম্বন করে, লেহন করে। এটাও চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণ্য আর নোংরা কর্ম। কোনো সম্ভ্রান্ত স্বামী ও স্ত্রী এমনটি করতে পারে না। ইসলামেও এই ধরণের কাজের সুযোগ নেই। মানবতাও এই কাজের অনুমোদন করে না। আধুনিক শিক্ষা আর টেলিভিশন ও অশ্লীল ভিডিও এই ধরণের কর্মের জন্মদাতা। এ সকল নোংরা কর্মসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১০. সঙ্গম শেষ হলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে নিজেদের যৌনাঙ্গ ভিন্ন কোনো কাপড় দিয়ে মুছে নিবে। বরং হাদীসে তো উভয়কে পেশাব করে, যৌনাঙ্গ ধৌত করে ও ওজু করে ঘুমানোর কথা বলা হয়েছে। এতে পবিত্রতাও অর্জিত হয়। দ্বিতীয়বার সঙ্গমের উদ্যমতাও সৃষ্ট হয়। যদি ওজু না করে, তাহলে কমপক্ষে তায়াম্মুম করে নিবে। এতেও এক ধরণের পবিত্রতা অর্জিত হবে।

১১. কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যতক্ষণ শরীর গরম থাকে, ততক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণ করা উচিত হবে না। ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারও স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। অবশ্য শক্তিবর্ধক কোনো ফলফ্রুট খাওয়া যেতে পারে।

১২. দ্বিতীয়বার সঙ্গম করার ইচ্ছা হলে প্রকৃত কামনা জাগ্রত হওয়ার আগেই সঙ্গম করা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। শরীয়াহ অনুযায়ী জায়িয তো অবশ্যই আছে।

যৌনাঙ্গ নাড়ানো বা সঙ্গমের দিকে নিজের মন-মস্তিস্ক ফিরানো ব্যতিতই যদি কামনা জাগ্রত হয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃত কামনা জাগ্রত হয়েছে। স্বেচ্ছায় কষ্ট করে কামনা জাগ্রত করার দ্বারা প্রকৃত কামনা জাগ্রত হওয়া বুঝায় না।

১৩. শুধু নিরেট নিজের যৌন চাহিদা পূরণের জন্যই সঙ্গম করবে না। বরং ভালো নিয়তে করবে। যেমন, মন এবং দৃষ্টি গুনাহ থেকে বাঁচানোর নিয়তে, স্ত্রীর অধিকার ও চাহিদা পূরণের নিয়তে, নেককার সন্তান প্রাপ্তি ইত্যাদি নিয়তে সঙ্গম করবে। এই নিয়তের বদৌলতে আনন্দ আর মজাও উপভোগ হবে, সওয়াবও পাওয়া যাবে। হাদীসে তো এমন সঙ্গমের দ্বারা সদকা করার সওয়াব পাওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে।

১৪. দ্বিতীয়বার সঙ্গমের সময় উদ্যমতার উপকরণগুলোর প্রতি যত্ন নিবে। বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীকে পরিপূর্ণ প্রস্তুত করে নিবে।

১৫. হায়য বা মিনস এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী নেফাস বা রক্তস্রাব চলাকালে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হারাম।

মিনসের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন, তিন রাত। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন, ১০ রাত।

আর সন্তান প্রসব পরবর্তী নেফাস বা রক্তস্রাবের সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নেই। অবশ্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন ও ৪০ রাত।

১৬. স্বামী-স্ত্রীর রাতের নির্জনতার কথাবার্তা ও কাজ-কারবারের কথা বন্ধু-বান্ধব এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে প্রকাশ করা অনুচিত। এটা অনেক বড় গুনাহ। হাদীসে বলা হয়েছে, অন্যদের সাথে এসব কথাবর্তা বলা তাদের সামনে ঐ সকল কাজ করার সমতুল্য. যা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্লজ্জতা[২০]।

(২০) এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই পুরুষ যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে পরবর্তীতে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়। একইভাবে যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিলনের পর গোপনীয়তা অন্যের কাছে বলে দেয়। সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং: ১৪৩৭।

সঙ্গম করার সময়সীমা

একবার স্ত্রী সঙ্গমের পর কত সময় পর সঙ্গম করা উচিৎ? এ বিষয়ে সুনিশ্চিত করে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা আর রুচি-অভিরুচি হিসেবে সময়সীমা বিভিন্ন রকমের হতে পারে[১]।

চিকিৎসকগণ বলেন, একমাসে একবারই করা উচিত। বেশি চাহিদা হলে দুইবার। যদি এতে প্রশান্তি অনুভব না হয়, তাহলে সপ্তাহে একবার।

সপ্তাহে শুধু একবার সঙ্গম করার কথা একটি হাদীসের ইঙ্গিত থেকেও বুঝা যায়। এক হাদীসে জুমুআর রাতে সঙ্গম করে গোসল ইত্যাদি সম্পন্ন করে জুমুআর সালাতের জন্য যেতে উৎসাহিত করা হয়েছে[২]। যাতে জুমুআর সালাতের জন্য আসা-যাওয়ার সময় কোথাও দৃষ্টি পড়ে মনের মধ্যে সঙ্গমের কল্পনা-জল্পনা সৃষ্টি না হয় এবং মানসিক প্রবৃত্তির কামনা পূরণ হওয়ার দরুন সালাত ও খুতবাতে মন ভালোভাবে বসে।

---

(১) 'অধিক সঙ্গমের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়া কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। শরীয়া এটা নিয়ে আলোচনাই করেনি। এটা চিকিৎসা সংক্রান্ত। তাই এটা নিয়ে চিকিৎসক আলোচনা করবে। অবশ্য অধিক সঙ্গমের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শক্তি আর সক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অপচয় আর অপব্যয় তো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অপছন্দনীয়'। -আশরাফ আলী থানবী রহ, "ইসলামী শাদী, পৃষ্ঠা: ২৪৪।

তিনি আরো বলেন, 'সুস্থতার সামনে মজার কী গুরুত্ব আছে! সামান্য সময়ের মজা। এরপর সাজা! স্বভাবজাত উদ্যমতার খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া চাই'। (প্রাগুক্ত: ২৪৫)

(২) একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন নিজে গোসল করে এবং অন্যকে গোসল করায়....'। (সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং: ৪৯৬) এই হাদীসে অন্যকে গোসল করানো দ্বারা অনেকে স্ত্রী সঙ্গমের পর গোসল করার কথা বলেছেন সেটার ইঙ্গিতেই এখানে লিখক হয়তো বলেছেন।

অবশ্য যদি চাহিদা এর থেকেও বেশি হয়, তাহলে সপ্তাহে দু'বার করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতি রাতে সঙ্গম করা বা একই রাতে বারবার সঙ্গম করা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। বিশেষত বর্তমান সময়ে তো ক্ষতির সম্ভাবনা একটু বেশিই; কারণ এখন মানুষের শরীর সাধারণত দুর্বল থাকে, খাবার-পানীয় নির্ভেজাল ও খাঁটি হয় না। তাছাড়া বারবার সঙ্গম মানুষের যৌবনকে দ্রুত নিঃশেষ করে দেয়; কারণ, একবার সঙ্গমের কারণে অনেক বীর্য নির্গত হয়। যা তৈরিতে ভালো খাবারের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, ভালো খাবারের বড়সড় একটা পরিমাণ একবার সঙ্গমের দ্বারাই শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের উপর দ্রুতই এর একটা প্রভাব পড়বে। ফলে সে বিভিন্ন প্রকার অসুস্থতার শিকার হয়ে যাবে। দ্রুত বীর্যপাতের রোগও পেয়ে বসতে পারে। যদি এই রোগ পেয়ে বসে, তাহলে তো সঙ্গমের সুখ, মজা আর আনন্দও কমে যাবে। স্ত্রীকে প্রশান্ত না করতে পারার দরুন পারস্পরিক অমিল তৈরি হয়ে যেতে পারে। অধিক বীর্যপাতের কারণে বীর্য পাতলা ও দুর্বল হয়ে যায়। তা থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানের উপরও যার প্রভাব পড়ে থাকে- ফলে সন্তান দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হতে পারে।

বারবার সঙ্গমের ক্ষেত্রে স্ত্রীর চাহিদা না থাকলে সে এই বৈধ সঙ্গমকে নিজের জন্য বিপদ আর যাতনার আয়োজন মনে করবে। যা বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য অনেক ক্ষতিকর।

তাছাড়া স্ত্রীরা সাধারণত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে অল্প পরিমাণ সঙ্গমেই তৃপ্ত হয়ে যায়। একবারের পূর্ণাঙ্গ চাহিদা পূরণ এক মাস পর্যন্ত তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি টেনে-টুনে তার চাহিদাকে উথলে দেওয়া হয়, তাহলে সে প্রচণ্ড চাহিদা সম্পন্ন হয়ে যাবে, সারাক্ষণ তার মাথায় এগুলোই চলতে থাকবে। এতে যৌন চাহিদার ভূত তার উপর ছেয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, কিছুদিন পর যখন তুমি দুর্বল হয়ে যাবে, তখন সে চাহিদা পূরণের জন্য হা-হুতাশ করতে থাকবে। সে তোমাকে কর্মের জন্য আহ্বান করবে, আর তুমি বিভিন্ন অজুহাত দিতে থাকবে। তুমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে চাইবে, কিন্তু সে জাগ্রত থাকতে বাধ্য করবে। তখন পারস্পরিক মনোমালিন্য তৈরি হয়ে যাবে। এসবই তোমার অপরিণামদর্শী

হওয়া এবং নিজের উপর কন্ট্রোল না থাকার কারণেই হয়েছে। আর তখন লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াতে হবে। চিকিৎসক আর কবিরাজদের কাছে দৌড়াদৌড়ি ব্যতিত কিছু করার থাকবে না। এত কিছুর পরও যদি আগের মতো অবস্থা তৈরি না হয়, তাহলে বিচ্ছেদেরও আশঙ্কা আছে। এ সময়ে যদি সে কোনো ভুল রাস্তা পেয়ে যায়, তাহলে তাতে পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই খুব ভেবে-চিন্তে নিজের এই অমূল্য সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া চাই। যাতে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, যৌবনের শক্তি বাকী থাকে, আনন্দ উপভোগ স্থায়ী হয় এবং সন্তানাদি সুস্থ থাকে ও শারীরিক পূর্ণতার সাথে জীবন যাপন করতে পারে[২৩]।

(২৩) কখনো কখনো সঙ্গম করা আবশ্যক হয়ে যায়। থানবী রহ. বলেন, 'যদি কোনো নারীর উপর দৃষ্টি পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। এরপরও যদি মনে সেই নারীর কোনো খেয়াল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে নিবে। এতে সেই নারীর কল্পনা অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে'। (ইসলামী শাদী, পৃ. ২৪৭)

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নারী যখন রাস্তায় বের হয়, তখন শয়তানের রূপ নিয়ে বের হয়। তোমাদের কেউ যদি কোনো নারীকে দেখে, তাহলে সে যেন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে মিশে। নিশ্চয় সেই নারীর সাথে যা আছে, তার স্ত্রীর সাথেও তা আছে"। জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং: ১১৫৮।

সঙ্গমের উপযুক্ত সময়

স্ত্রী সঙ্গমের জন্য দিনের তুলনায় রাতের সময়টা বেশি উপযুক্ত। চন্দ্রমাস হিসেবে মাসের প্রথম, ১৫ তম এবং শেষ রাত ব্যতিত অন্যান্য রাতগুলোতে স্ত্রী সঙ্গম করা উচিত; কারণ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই তিন রাতে শয়তান যমীনে অধিক পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে।

কতক ফকীহ্ লিখেছেন, জুমুআর রাতে স্ত্রী সঙ্গম করা মুস্তাহাব।

এ রাত সহ অন্যান্য রাতের প্রথম অংশের তুলনায় শেষ অংশে সঙ্গম করা বেশি উপযোগী। তাই রাতের প্রথম অংশে কিছু সময় ঘুমাবে। যাতে করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি অর্জিত হয়। এরপর সঙ্গম করবে।

এ ছাড়া রাতের শেষাংশে সঙ্গম করার আরেকটি উপকারিতা হলো, এতে রাতের সামান্য অংশই কেবল অপবিত্র অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অবশ্য এতটা শেষ রাতেও করা উচিত না যে, কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আরাম করার কোনো সময় পাওয়া যায় না। বরং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর কিছু সময় আরাম করা যেতে পারে, এতটুকু সময় অবশিষ্ট রেখে সঙ্গমে লিপ্ত হবে।

সঙ্গম করার পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীর শরীরের সকল অঙ্গ দিয়ে স্বামীর জন্য সবরকমের উপকারিতা অর্জনের অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করা (পায়ুসঙ্গম বা এনাল সেক্স) হারাম; কারণ ওটা সঙ্গমের স্থানই না। তাই স্ত্রীর সামনের রাস্তা দিয়েই সঙ্গম করতে হবে। এর জন্য যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ স্বামীর রয়েছে। অবশ্য ইসলামী শরীয়ার বিভিন্ন ভাষ্যের ইঙ্গিতে দু'টি পদ্ধতিকে ভালো ও উত্তম অনুমিত হয়।

(১) প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই যেটা স্বাভাবিক। স্বামী উপরে থাকবে, আর স্ত্রী নিচে। এই পদ্ধতির একটা উপকারিতা হলো, স্বামী পরিপূর্ণভাবে শরীর আপ-ডাউন করতে পারে। যার দ্বারা অধিক পরিমাণ আনন্দ পাওয়া যায়। এর আরেকটা উপকারিতা হলো, স্ত্রীর উপর কিছুটা চাপ পড়ে। যার কারণে সে খুব সুখ পায় এবং দ্রুত তার বীর্য স্খলন হয়ে যায়। তাছাড়া জরায়ুতে বীর্য পৌঁছতে এ পদ্ধতিটি অনেক সহকারী।

পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিতে এই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا

> অর্থাৎ "স্বামী (আদম আ,) যখন স্ত্রীকে (হাওয়া আ,) ঢেকে নিয়েছে, তখন সে হাল্কা বোঝা বহন করেছে।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং: ১৮৯)

এই ঢেকে নেওয়ার পদ্ধতি ঐটাই। অর্থাৎ স্ত্রী চিৎ হয়ে শোবে। আর স্বামী তার উপর উপুড় হয়ে শয়ন করবে; যাতে স্ত্রীর সকল অঙ্গের বিপরিতে স্বামীর অঙ্গ পাওয়া যায়।

(২) এক হাদীসে বলা হয়েছে,

اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها

> অর্থাৎ "স্বামী যখন স্ত্রীর যৌনাঙ্গের চারদিকে বসে যায় এরপর স্ত্রীকে কষ্টে ফেলে (অর্থাৎ যৌনাঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করায়)[২৪]

"শুআবুন আরবা" (চার শাখা) দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ নিয়ে একাধিক মন্তব্য আছে। গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীর দুই রান এবং দুই নিতম্ব। এ চারটার মধ্যে বসা তখনই সম্ভব, যখন স্ত্রী চিৎ হয়ে শুয়ে উভয় হাঁটু উঠিয়ে রাখবে। আর স্বামী সেখানে বসে সঙ্গম করবে। গর্ভধারণের জন্য এই পদ্ধতি অনেক উপকারী; কারণ এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর জড়ায়ু পুরুষাঙ্গের মুখোমুখি হয়ে থাকে।

---

(২৪) আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সে যখন স্ত্রীর চার শাখার মধ্যে বসবে, এরপর তাকে কষ্ট ফেলবে (যৌনাঙ্গ প্রবেশ করবে) তখন তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে"। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ২৯১)

মূলত, ইসলামের প্রথম দিককার বিধান অনুযায়ী বীর্য নির্গত না হলে যতোই সঙ্গম করা হোক, ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হতো না। পরবর্তীতে এই হাদীসে বিধান আসলো, যদিও বীর্য নির্গত না হয়, কিন্তু স্বামীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগের স্থানটি স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করে, তাহলেও তাদের উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

সতর্কতা

(১) স্ত্রী যদি কুমারী বা ভার্জিন হয়, তাহলে প্রথমবার সঙ্গমের সময় তার কুমারিত্বের পর্দা ফেটে গিয়ে তার অনেক কষ্ট হয়। যার দরুন সে ঘাবড়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে নম্র আচরণ করা উচিত। আপ-ডাউন কম করা উচিত।

(২) কুমারী মেয়ের সাথে বিয়ে হলো। কিন্তু তার কুমারিত্বের পর্দার অনুমান করা গেলো না। যদি সেই মেয়ে সচ্চরিত্রা হয়, অন্যায়-অশ্লীলতার কোনো নিদর্শন তার মধ্যে পাওয়া না যায়, তাহলে শুধু কুমারিত্বের পর্দা না থাকায় তাকে অভিযুক্ত করা উচিত হবে না; কারণ ফকীহগণ লিখেছেন এবং চিকিৎসকগণও বলেন যে, নারীর কুমারিত্বের পর্দা অনেক সময় লাফানো, দৌঁড়ানো বা কোথায় পড়ে যাওয়ার কারণে ছিড়ে যেতে পারে। অধিক মিনসের কারণে, এমনিভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিয়ে না হলেও তার কুমারিত্বের পর্দা ছিড়ে যেতে পারে[২৫]।

(২৫) কুমারিত্বের পর্দা বা আবরণ ছিড়ে যাওয়ার কারণ কী কী?

এমন এক প্রশ্নে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ আল্লামা বানূরী টাউন থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছিলো, "কুমারিত্বের আবরণ না থাকার একাধিক কারণ হতে পারে। যেমন, বিবাহে বিলম্ব, কোনো অসুস্থতা, খেলাধুলা, কোনো স্থান থেকে লাফ দেওয়া অথবা কোনো আঘাত পাওয়া, ইত্যাদি। পুরুষ-মহিলার সঙ্গম ব্যতিত এই সকল কারণে কুমারিত্বের আবরণ ছিড়ে গেলেও সেই মহিলাকে শরীয়া অনুযায়ী কুমারী গণ্য করা হবে। সুতরাং কোনো নারীর কুমারিত্বের আবরণ না থাকলেই তাকে যিনা করেছে ধারণা কোনোভাবেই উচিত নয়। হানাফী ফিকহ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যগ্রন্থ 'আল-ইনায়া' এবং 'কানযুদ দাকায়িকে'র ভাষ্যগ্রন্থ 'আন-নাহরুল ফায়িক' কিতাবদ্বয়ের সূত্রে এই উত্তর লেখা হয়েছিলো।

অপবিত্রতার গোসল

রাতে সঙ্গম করার পর সকাল হলেই ফজর নামাযের আগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গোসল করে নিবে। এটাকে জানাবাত বা অপবিত্রতার গোসল বলে। অপবিত্রতার গোসল খুব গুরুত্ব সহকারে করা উচিত। বিশেষত স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজের যৌনাঙ্গ যত্ন নিয়ে ধৌত করবে। পুরুষ নিজের যৌনাঙ্গ ধৌত করবে। খতনা করার স্থানটা একটু ভালো করে মলবে; কারণ এখানে আদ্রতা জমাট হয়ে থাকতে পারে। ভালো করে না ধুইলে সেখানকার চামড়ায় সমস্যা হতে পারে। এমনিভাবে স্ত্রীও নিজের যৌনাঙ্গের ভেতরে ভালো করে ধৌত করবে। গোসলের পূর্বে উভয়েই পেশাব করে নিবে; যাতে বীর্যের কিছু অংশ ভেতরে আটকে থাকলে বের হয়ে যায়।

জানাবাতের গোসলের পদ্ধতি

শরীরের যে অংশে বীর্য লেগেছে, প্রথমে সে অংশটি ভালো ভাবে ধৌত করবে। এরপর ওজু করবে। এরপর পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবে।

এই গোসলের ফরয তিনটি ।

(ক) ভালোভাবে কুলি করা।
(খ) নাকের ভেতর পানি দেওয়া।
(গ) পুরো শরীরে পানি পৌঁছে দেওয়া।

জানাবাতের গোসল না করা

জানাবাত বা অপবিত্রতার গোসল করা ব্যতিত ঘরে পড়ে থাকা বরকতহীনতা এবং অমঙ্গলের কারণ। এই গোসল করতে লজ্জা করা অনুচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "গোসল ফরয অবস্থায় গোসল না করে ঘরে পড়ে থাকলে, রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে না"[২৬]। অর্থাৎ অলসতা এবং গুরুত্বহীনতার কারণে গোসল না করে এমনভাবে ঘরে থাকা যে, নামায ক্বাযা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে না। অবশ্য, রাতের কিছু সময় অপবিত্র অবস্থায় শুয়ে থাকলে সমস্যা নেই[২৭]।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ

সঙ্গমের দ্বারা যেমন গোসল ফরয হয়, ইহতিলাম বা স্বপ্নদোষ দ্বারাও তেমনি গোসল ফরয হয়। অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কিছু দেখে বীর্য বের হলেও গোসল ফরয হয়।

অর্ধঘুম অবস্থায় বীর্য বের হলেও গোসল ফরয হয়। জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হলে, কোনো নারীকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করার কারণে উত্তেজনা এসে বীর্য বের হলেও গোসল ফরয হয়। মহিলাদের এই সকল কারণ সাধারণত কম হয়।

সঙ্গমের সময় পুরুষের যৌনাঙ্গের খতনাকৃত উন্মুক্ত স্থানটা যদি নারীর যৌনাঙ্গের মধ্যে ঢুকে যায়, তাহলে উভয়েব উপরই গোসল ফরয হয়ে যাবে। ভেতরে প্রবেশ না করলে যার বীর্য নির্গত হবে, তার উপরই কেবল গোসল ফরয হবে।

---

(২৬) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "(রহমতের) ফেরেশতা এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কোনো প্রাণির আকৃতি, কুকুর এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি আছে"। সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং: ২৬১।

(২৭) ইমাম খাত্তাবী এবং ইবনুল আছীর রহিমাহুমাল্লাহু বলেন, 'এই হাদীসে গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি দ্বারা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে সাধারণত অপবিত্রতার গোসল করে না। অধিকাংশ সময় অপবিত্রতাতেই কাটিয়ে দেয়'। (শরহুন নাসাঈ, ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহু কৃত: ১/১৪১)

যিনার ভয়াবহতা

বিবাহের ফযীলাত ও তার আদাবসমূহ আলোচনা করার পর এখানে যিনার ভয়াবহতা ও তার কদর্যতা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে যে নারী আজনবী বা অপরিচিত, (অর্থাৎ নিজের স্ত্রী এবং শরীয়ত সমর্থিত দাসি ব্যতিত অন্য কোনো নারী) তার সঙ্গে নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করাকে যিনা বলা হয়। এটা অত্যন্ত নোংরা এবং খুবই খারাপ কাজ। এটাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআন-হাদীসের অনেক স্থানে যিনার অশ্লীলতা এবং কদর্যতা আলোচিত হয়েছে।

যিনার কারণে মানুষ দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়। বিভিন্ন ধরণের ভয়াবহ রোগ-ব্যাধির শিকার হয়। যদি ইসলামী বিচার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে যিনাকারী অবিবাহিতকে শরীয়ার সকল শর্তাবলী মেনে জনসম্মুখে ৮০ টি বেত্রাঘাত করা হতো। আর যিনাকারী বিবাহিতকে শরীয়ার সকল শর্তাবলী মেনে জনসম্মুখে পাথরের আঘাতে আঘাতে হত্যা করা হতো। ফলে মানুষ ভয়ে এই ধরণের অন্যায় থেকে বিরত থাকতো।

ইসলামে যিনা করা যেমন হারাম, পুং মৈথুন, লাওয়াতাত বা সমকামিতাও হারাম। বরং যিনা থেকেও এটা আরো বেশি নোংরা, অশ্লীল এবং কদর্য। এই নোংরা কাজের কারণেই নবী লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর কঠিন শাস্তি এসেছিলো। কুরআনে এই অপরাধ এবং লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত শাস্তির কথা বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে।

সমকামিতা বা পুং মৈথুনের শাস্তি অন্যান্য ইমামদের নিকট যিনার শাস্তির মতো-ই। কিন্তু হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে লাওয়াতাত বা পুং মৈথুনের শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সময়কার শাসক বা বাদশার অধিকার রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পাহাড় বা অন্য কোনো উঁচু স্থান থেকে ফেলে হত্যা করতে পারেন। ইচ্ছা করলে আরো ভয়াবহ শাস্তি দিতে পারেন।

ওলীমা

স্ত্রীকে উঠিয়ে নেওয়ার পর যখন দু'জনের একরাত নির্জনতায় কাটবে, তখন ওলীমার দাওয়াত করা সুন্নাত। এতে নিজের অবস্থান অনুযায়ী খরচ করবে। যদি আল্লাহ্ তাআলা সম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আলিম ও নেককারদেরকে এক বেলা খাওয়াবে। আর যদি আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকে, তাহলে ভাত-রুটি যা সম্ভব হয়, অল্প কজনকে ডেকে খাওয়াবে। কিন্তু কারো থেকে করয নিয়ে, ধার করে দাওয়াত করার কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার নিজের ওলীমার সময় দস্তরখান বিছিয়ে সাহাবিগণকে বললেন, 'যার কাছে যে খাবার আছে, নিয়ে আসুক'। এরপর সব খাবার একত্রিত করে সাহাবিদেরকে খাবারে অংশ গ্রহণ করানো হয়েছে। এরচেয়ে বড় সরলতা আর কী হতে পারে?!

অবশ্য দাওয়াতের সময়ে শুধু ধনী আর নেতাদেরকেই দাওয়াত দিবে না। বরং গরীবদেরকেও দাওয়াত দিবে। তারাই এই দাওয়াত পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। যে সকল খাবার অনুষ্ঠানে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, গরীবদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, সেগুলোকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে মন্দ খাবার বলেছেন[২৮]। তাই দাওয়াত ধনী-গরীব সকলকেই দিবে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক্ব বা অধিকার

বিবাহের পরপরই স্বামী-স্ত্রীর একজনের উপর অন্যজনের অধিকার এসে যায়। তাই প্রত্যেককে নিজের উপর আসা অন্যের অধিকারগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। অধিকার আদায়ের এই চিন্তার ফলেই পারস্পরিক অধিকারগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে, উভয়ের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং অটুট থাকবে।

---

(২৮) আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার, সেই ওলীমার খাবার, যার জন্য শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয়, গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না"। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ৫১৭৭)

১. উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হলো, একে অন্যের মানসিকতা, চাহিদা আর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। কতক মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই খুব বেশি কামনাসম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে সে বারবার তা পূরণ করতে চায়। আর কেউ কেউ প্রকৃতিগতভাবে কম চাহিদাসম্পন্ন হয়, ফলে চাহিদা পূরণে তার আগ্রহ কম থাকে। যদি স্বামী আর স্ত্রী উভয়ের যৌনচাহিদা এক পর্যায়ের হয়, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে একজনের চাহিদা বেশি, কিন্তু অপরজনের কম। যদি স্বামীর চাহিদা বেশি থাকে, তাহলে তার জন্য নিজেকে খুব বেশি কন্ট্রোল করা উচিত। স্ত্রীর মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাড় দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে যদি স্বামী দুর্বল চাহিদা সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য উচিত স্ত্রীর চাহিদা পূরণের জন্য সক্ষমতাবর্ধক বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করা। এমন যেন না হয় যে, স্বামী নিজের প্রাকৃতিক অভ্যাসের দরুন খুবই কম সঙ্গম করে। ওদিকে স্ত্রী সঙ্গমের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। এমন হলে অনেক বেশি সমস্যার আশংকা আছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো ভালো খাবার খাওয়া। যেমন, ছোটো প্রাণী বা পাখির গোশত, হাফ সিদ্ধ ডিম, মাছ, বাদাম ইত্যাদি। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যমপন্থা গ্রহণের মাধ্যমেই বৈবাহিক জীবন সুখি হয়ে ওঠবে।

২. মিনসের সময় এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাবের সময় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা না-জায়িয ও হারাম এ সময় নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান কাপড়মুক্ত করাই অনুচিত। এ অংশটুকু ব্যতিত শরীরের অন্যান্য অঙ্গসমূহ থেকে মজা উপভোগ করা এবং উভয়ে একসাথে শয়ন করা জায়িয। অবশ্য যদি সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে স্ত্রীর শরীর নিয়ে আনন্দ করবে না। এ সকল মুহূর্তে স্ত্রীকে নিজের ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় কোনো ত্রুটি অনুভব করতে দিবে না। কিন্তু সঙ্গম থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। মূলত, স্ত্রী শুধু নিজের যৌন চাহিদা পূরণ আর সন্তান প্রসবের জন্যই না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানেই প্রজ্ঞাপূর্ণ এক গভীর ভালোবাসা আর আন্তরিকতার সম্পর্ক। যেই সম্পর্কের সাহায্যে সকল দুর্বলতা আর অশান্তি দূর হয়ে অন্তর পরম ভালোবাসায় মথিত থাকে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামী যখন বিয়ে করে স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে, তখন থেকেই স্ত্রীর রক্ষণা-বেক্ষণ করা আর তার যাবতীয় অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া স্বামীর-পরম কর্তব্য।

ইসলামী শরীয়ত দায়িত্ব স্বরুপ স্বামীর উপর স্ত্রীর তিনটি অধিকার আবশ্যক করেছে।

ক. স্ত্রীর খাবার খরচ।
খ. স্ত্রীর পোশাক-আশাকের খরচ।
গ. স্ত্রীর থাকার জায়গা বা বাসস্থানের খরচ।

স্ত্রীর প্রথম দুই অধিকার অর্থাৎ খাবার আর পোশাকের ক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক অবস্থান হিসেবে ব্যয় করতে হবে। সে নিজেও খাবে, স্ত্রীকেও খাওয়াবে। নিজেও পোশাক পরিধান করবে, স্ত্রীর পোশাকেরও ব্যবস্থা করবে। এ দুইটা বিষয়ের জন্য স্ত্রীর উপার্জন করার প্রয়োজন নেই। তাকে উপার্জনের জন্য সৃষ্টিই করা হয়নি। স্ত্রীর এ দুই অধিকার পূরণে স্বামী শরীয়াতের সীমারেখায় থেকে স্ত্রীর রুচি-অভিরুচির প্রতি কেয়ার করবে।

স্ত্রীর তৃতীয় অধিকার অর্থাৎ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও স্বামীর উপর আবশ্যক। যদি স্বামীর ঘরে অবস্থানকারী একাধিক থাকে, স্বামীর পিতা-মাতাসহ অন্যান্যরা থাকে, তাহলে কমপক্ষে এমন একটা রুমের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, যেখানে স্বামী আর স্ত্রী নির্জনে নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারে। ঘরে যদি অনেক মানুষ বসবাস করে, তাহলে নন-মাহরাম আত্মীয়দের সামনে স্ত্রীর আসা-যাওয়া হয়ে যেতে পারে। তাই পুরুষ আর নারীদের চলাচলের ব্যবস্থা ভিন্ন করে নেওয়া উচিত। গোসলখানা, বাথরুম এবং খাবার গ্রহণের স্থান কমপক্ষে ভিন্ন থাকা চাই।

সংক্ষিপ্তাকারে এখানে এতটুকুই উল্লেখ করা হলো। প্রতিজন ব্যক্তিরই পারস্পরিক আচার-আচরণ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া উচিত।

চারিত্রিক অধিকার

আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে এমন কিছু বৈশিষ্ট দিয়েছেন, যেগুলো নারীদের মধ্যে সাধারণত কম পাওয়া যায়। যেমন, সাহসিকতা, বাহাদুরী, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ, আত্মমর্যাদা, মীমাংসা করার সক্ষমতা, নেতৃত্বগুণ ও ক্ষমতা প্রয়োগগুণ ইত্যাদি। এগুলো পুরুষদের মধ্যে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে পাওয়া যায়। এজন্যই স্বামীকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ববান করা হয়েছে। তাই স্ত্রীর চারিত্রিক পরিশুদ্ধতার প্রতি যত্নবান হওয়া স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রী যদি ঘরের চাকর-কর্মচারি এবং অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হাসি-তামাশামূলক আচরণ করে, তাহলে স্বামী সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে এ সকল বিষয়ে সতর্ক করবে এবং এগুলো থেকে তাকে বিরত রাখবে। শুরুতেই এগুলো বাস্তবায়ন করা, স্ত্রীকে সতর্ক করা সহজ। প্রথমে অবহেলা করলে পরবর্তীতে অবস্থা নিজের হাত ফসকে বের হয়ে যাবে। স্ত্রীদের মধ্যে অসদাচরণ দেখে যে সকল স্বামীর মধ্যে কোনো প্রভাব আসে না; ফলে তারা সংশোধনের চেষ্টা করে না, হাদীসে তাদেরকে দাইউস বলা হয়েছে। তাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। স্ত্রীকে এমন মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দিবে না যে, সে যা চাইবে নির্ভয়ে বলে যাবে। যা ইচ্ছা-হাসি-তামাশাচ্ছলে করে যাবে। মনে রাখতে হবে, স্ত্রী অনেক মূল্যবান। স্বামীরই দায়িত্ব এই মূল্যবান কোহিনূর সংরক্ষণ করা। নিজের ঘরে অযথা মানুষদের বেশি আনাগোনাকে সুদৃঢ়ভাবে দমন করবে।

স্ত্রীর ভুলগুলো সংশোধন করার পদ্ধতি

স্ত্রীকে সংশোধন করার জন্য সতর্ক করবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং আন্তরিকতার সাথে। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে তার উপর গর্জন-বর্ষণ শুরু করবে না। তুচ্ছ বিষয়ে নিয়ে হুঙ্কার প্রধান আর মারধর শুরু করে দিবে না। এসব ভদ্রতা আর মানবতা বিবর্জিত আচরণের শামিল। সাধারণ বিষয় নিয়ে তার উপর সন্দেহ করা শুরু করবে না। বরং প্রজ্ঞা আর বুদ্ধিমত্তার সাথে তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

স্ত্রীর কোনো অসংলগ্ন আচরণ যদি তোমার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে একটু ভ্রুক্ষেপহীনতা আর কেয়ারলেসের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করবে। যদি এতে সে সতর্ক না হয়, তাহলে এক-দুই রাত তার সাথে না শুয়ে অন্য স্থানে শয়ন করবে। উভয়ের অন্তরে ভালোবাসা থাকলে এতটুকুই যথেষ্ট। হাঁক-ডাক আর গালি-গালাজের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এতেও যদি সে ভুল পথ থেকে সরে না আসে, তাহলে সামান্য পরিমাণ প্রহারের অনুমতি আছে। চাকর-নোকরদের মতো প্রহার করা তখনও নিষিদ্ধ। এক হাদীসে বলা হয়েছে,

> "তোমাদের কেউ যেন স্বীয় স্ত্রীকে গোলামের মতো প্রহার করে, দিন শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত না হয়"[২৯]। (অর্থাৎ এটা কেমন কথা হলো যে, দিনের শুরুতে স্ত্রীকে প্রহার আর সন্ধ্যায় তার সঙ্গেই সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। এটা তো নির্লজ্জতা)

মনে রাখতে হবে, ঘরোয়া কোনো বিষয়ে স্ত্রীর অসন্তুষ্ট হওয়া এবং স্বামীর কাছে করা তার কোনো দাবী পূরণ না হলে তার মনক্ষুণ্ণতা এগুলো নিতান্তই তার প্রাকৃতিক এবং স্বভাবজাত বিষয়। বরং এগুলো তার প্রেয়সী স্বভাবের সৌন্দর্য।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর কোনো আচরণে যদি ক্রোধ এসে যায়, তাহলে স্বামীর জন্য উচিত অত্যন্ত যত্নের সাথে নিজেকে কন্ট্রোল করা। কোনোভাবেই তার জন্য কন্ট্রোলহীন হওয়া উচিত হবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে, নিজের স্ত্রীর কাছে ভালো। আর তোমাদের মধ্যে আমিই স্বীয় স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে ভালো"[৩০]।

তাই স্ত্রীর কঠোর মেজাজ আর তীব্র স্বভাবের জন্য স্বামীকে ধৈর্য রাখতে হবে। যদি ক্রোধ খুব বেশি আসে, তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করবে। আউযু বিল্লাহ পড়বে।

---

(২৯) সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ৪৯০৮। অর্থাৎ দিনের বেলা তাকে ক্রীতদাসের মতো প্রহার করলো, আর রাতের বেলা তার সাথেই সঙ্গম করলো। এটা কতোটা লজ্জা আর আশ্চর্যপূর্ণ কথা।

(৩০) জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৮৯৫।

পানি পান করবে। ক্রোধের সময়কার অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলবে[৩১]। মনে রাখতে হবে, যোদ্ধাদেরকে মাটিতে ভূপাতিত করাই সাহসিকতা আর বীরত্ব না, বরং আসল বীরত্ব হলো। ক্রোধের সময়ে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারা[৩২]।

স্ত্রীর সাথে ক্রোধের সময় নিজেকে কন্ট্রোল করার অভ্যাস যদি না হয়, তাহলে আল্লাহ না করুক তালাক জাতীয় কোনো শব্দ মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে, ফলে পুরো জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। আফসোস করতে করতে পস্তাতে হবে। ক্রোধের সময় কোনো ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই কোনো কারণে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ আসলে চিন্তা-ভাবনা করে এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করেই কোনো সমাধানে আগানো উচিত।

এগুলো ছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে, স্ত্রীর অধিকার আদায়ে যেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া অত্যন্ত উপকারী।

(১) স্ত্রীকে সর্বদা পর্দাহীনতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। নন-মাহরাম পুরুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা এবং তাদের নিকট আসা-যাওয়া করা থেকে তাকে বারণ করে দিবে।

(২) স্ত্রী সবসময় স্বামীর সামনে সেজে-গুজে থাকবে। এতে স্বামীর দৃষ্টি অন্য কারো উপর যাবে না। তার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি কোনো অস্বচ্ছতা থাকবে না। শরীয়াতেও এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত স্বামী যখন দূর-দূরান্ত থেকে আসে, তখন স্ত্রী বিশেষ সাজসজ্জা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে আসলে সাহাবিদের নিয়ে মদীনার বাহিরে অবস্থান করতেন। যেন মদীনায় থাকা স্ত্রীগণ সংবাদ পেয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করে।

(৩১) আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো রাগ আসে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে। তাতে যদি রাগ না দমে, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে"। সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ৪৭৮৪।

(৩২) সহীহ মুসলিমের ২৬০৯ নং হাদীসে এরকম বলা আছে।

(৩) স্ত্রীর জন্য স্বামীও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। সুন্দর কাপড় পরিধান করবে। এতে স্ত্রীর ঝোঁক আর আকর্ষণ তার দিকেই বহাল থাকবে।

(৪) স্ত্রী যদি মূল্যবান কাপড় আর দামী দামী অলংকারের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে, তাহলে প্রজ্ঞার সাথে তাকে দুনিয়া বিরাগী বুযুর্গ আর আল্লাহর ওলীদের ঘটনা শুনাবে। দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা তার সামনে তুলে ধরবে। এতে প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত সম্পদের প্রতি তার আগ্রহ কমে যাবে। এভাবে যদি তার এই আগ্রহ না কমানো হয়, তাহলে তার এই মানসিকতা পুরো ঘরকে বিনষ্ট করে ছাড়বে।

(৫) স্ত্রীর কোনো কাপড় বা অলংকার যদি অপরিচিত মনে হয়, তাহলে সেটা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি লাভ করবে। কোথা থেকে এসেছে? কীভাবে এসেছে? সব জেনে নিবে। নচেত বিচ্যুতির রাস্তা এখান থেকেই শুরু হবে।

(৬) বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত স্বামী নিজের সকল সময় কাজ-কারবারেই ব্যয় করবে না। বরং স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ-উল্লাস করার জন্যও কিছু সময় অবশ্যই ব্যয় করবে।

(৭) স্ত্রী যদি গুণবতী হয় এবং ভালো কাজ করে, তাহলে কখনো কখনো তার প্রশংসাও করবে। এতে সে অত্যন্ত আনন্দিত হবে।

(৮) স্ত্রীর ইশারা-ইঙ্গিত বুঝার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। স্ত্রীরা অনেক বিষয় মুখে প্রকাশ করে না। বরং ইশারা-ইঙ্গিত এবং চেহারার হাসি-রাগ দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করে।

(৯) সন্তানদের সামনে স্ত্রীর ওপর রাগ করবে না। কারণ সন্তানদের সামনে স্ত্রীর ওপর রাগ করলে ঘরের আনন্দ-খুশি হারিয়ে যায়। সন্তানরা মায়ের প্রতি অশ্রদ্ধ হয়ে যায়। তাদের অন্তরে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে না।

(১০) স্ত্রী-সন্তানদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্তরিকতা আর মুহাব্বাতের সাথে থাকবে। পাহাড় ধ্বসিয়ে দেওয়া দৈত্য আর ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খাওয়া চিতাবাঘের মতো থাকার অভ্যাস করবে না। সবসময় বিচারকসুলভ আচরণও করবে না।

(১১) স্বীয় স্ত্রীর সামনে অন্য কোনো নারীর প্রশংসা করবে না। তার সামনে অন্য কারো রূপ-সৌন্দর্যের আলোচনা তার হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এতে তুমি তার দৃষ্টিতে সন্দেহে পড়ে যাবে।

(১২) ঘরোয়া কাজ-কারবারে তার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিবে। এ বিষয়ে তার মতামত প্রায় সময়েই বিশুদ্ধ হয়।

(১৩) স্ত্রীর সাথে কোনো বিষয়ে দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করবে না। সে এর উপযুক্তই না। তার ঝোঁক আর আকর্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, সে এটারই উপযুক্ত।

(১৪) স্ত্রী যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে তাকে সুন্দর আচার-আচরণ আর ধর্ম সম্পর্কিত লিখিত গ্রন্থাবলী পড়তে দিবে। নভেল, উপন্যাস আর কিচ্ছা-কাহিনীর বই পড়তে দিবে না।

(১৫) ঘরে কখনো কিছু হলে, ঘরেই সেটার নিস্পত্তি করে দাফন করে দিবে। অন্যদের সামনে সেটাকে ছড়াতে দিবে না।

(১৬) অসৎ নারীদের সাথে স্ত্রীকে কখনোই মিশতে দিবে না। তাদের সাথে মিশতে দিলে তারা তোমার স্ত্রীকেও ধ্বংস করে দিবে।

(১৭) নিজের মা-বোন এবং স্ত্রীর সাথে ঘরে যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে উভয়ের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমস্যা নিস্পত্তি করে দিবে।

(১৮) ঘরোয়া বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা করবে না। একেবারে কোমলও হবে না।

(১৯) আল্লাহ না করুক, যদি কোনো অসদাচারি এবং খারাপ নারীর সাথে সংসার বনে যায়, তার সংশোধনেরও কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই কল্যাণকর হবে।

কিন্তু এ বিষয়টা মনে রাখবে, হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীরা বাম পাঁজরের উপরের দিকের সবচেয়ে বাঁকা হাড় থেকে তৈরি। তাই বাঁকা থাকাবস্থাতেই তার থেকে উপকৃত হতে হবে। পুরোপুরি সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। স্বামীর জন্য সাধ্যানুযায়ী সহনশীলতার সাথে কার্য সম্পাদন করা উচিত। যতদূর সম্ভব তালাক থেকে বিরত থাকা চাই। ইসলাম তালাক প্রদানকে পছন্দ করেনি। বরং তালাককে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ বলে অভিহিত করেছে[৩৩]। অর্থাৎ বৈধ যতো কাজ আছে, তার মধ্য হতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো তালাক। অনেক ভেবে-চিন্তে এবং নিজের বিশেষ অন্তরঙ্গদের সাথে পরামর্শ করেই তালাকের দিকে এগুতে হবে। এক তালাকেই ক্ষান্ত হবে। একসঙ্গে তিন তালাক কোনো ক্রমেই দিবে না।

(২০) স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় বা তার মাসিকে কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে যতো দ্রুত সম্ভব তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

(৩৩) ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **"তালাক দেওয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ বিষয়"**। (সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ২১৭৮) আরো দেখা যেতে পারে, উমদাতুল কারী: ২০/২২৫।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

স্বামীর উপর যেমন স্ত্রীর অনেকগুলো শরয়ী এবং চারিত্রিক অধিকার আছে, ঠিক তেমনি স্ত্রীর উপরও স্বামীর অনেকগুলো অধিকার আছে, যেগুলো সম্পাদন করা স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(১) স্ত্রীর উপর স্বামীর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো নিজ সত্ত্বাকে সংরক্ষণ করা। সে যেহেতু নিজেকে স্বামীর জন্য সোপর্দ করে দিয়েছে, তাই সর্বদা নিজ সত্ত্বার সংরক্ষণ করবে। স্বামী উপস্থিত থাক বা অনুপস্থিত, অন্য কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে নিজ স্বামীর সঙ্গে সবচেয়ে বড় খেয়ানত। তাই, এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার নীতি মেনে সযত্নে থাকবে। সবধরণের আউট সম্পর্ক থেকে শতভাগ দূরে থাকবে।

(২) স্বামী তাকে যে সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো নিজ যৌন চাহিদাকে অন্যায় এবং অশ্লীল জায়গায় ব্যয় না করে বৈধ এবং ভালো জায়গায় পূরণ করা। তাই স্বামী যখন সঙ্গমের ইচ্ছা করবে, তখন তাকে সুযোগ করে দিবে। অযথা বাহানা দেখাবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "স্বামী যদি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনের জন্য (সঙ্গমের) আহ্বান করে, তখন স্ত্রী যেন স্বামীর কাছে যায়। যদিও সে রান্নার চুলায় থেকে থাকে"[৩৪]।

রাতে তো স্বাভাবিক। যৌন চাহিদা তৈরী হলে দিনের বেলাও সঙ্গম করা যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ দিনের বেলা স্ত্রী সঙ্গম করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।

(৩) স্বামীর অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণ করবে। স্বামীর সন্তুষ্টির বাহিরে এবং ভুল জায়গায় তা ব্যয় করবে না। প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত খরচ করবে না। বরং আত্মতৃপ্তিকে নিজের পরিচিতি বানিয়ে নিবে। অল্পেতুষ্টির মতো মহৎ গুণে নিজেকে সাজাবে।

---

[৩৪] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং: ১৬৩৩১।

(৪) ঘরোয়া বিষয়াদি ভালো করে শিখে নিবে। স্বামীর রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক ও ঘর-দোড়ের ব্যবস্থা করবে। ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। স্বামী যে কাপড় পছন্দ করে, সেটা পরিধান করবে। রান্না যেভাবে তার পছন্দ, সেভাবেই তৈরী করবে।

(৫) স্বামীর কথা বা কাজে বারবার ক্ষিপ্ত হওয়া এবং নিজের দাবী পূরণ না হলে স্বামীর উপর নারায হয়ে যাওয়া স্ত্রীর জন্য শোভনীয় না। এতে মুহাব্বাতে ভাটা পড়ে। স্বামী তখন স্ত্রীকে এক ধরণের বোঝা মনে করতে থাকে। এ ধরণের মন্দ অভ্যাস থেকে স্ত্রীদের জন্য বেঁচে থাকা উচিত। অভিমান করলেও সীমার মধ্যে থাকবে। অতিরিক্ত অভিমানও ভালো না।

(৬) স্বামীর কোনো কথায় ক্রোধ দেখানো, বাজে কথা বলা এবং গালি-গালাজ করা স্ত্রীর চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্লজ্জতার পরিচায়ক। স্বামী যদি নিজের সম্মান বা কোনো কারণে বাধ্য হয়ে কিছু নাও বলে, তবুও স্ত্রীর জন্য যা ইচ্ছে করতে থাকা অনুচিত। স্ত্রী যদি এমন আচরণ করতে থাকে, তাহলে স্বামীর অন্তর থেকে তার ভালোবাসা এবং তার গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে বাস্তবতা কখনো বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। তখন তো স্ত্রীর চোখের পানি মুছে দেওয়ারও কেউ থাকবে না।

(৭) স্ত্রীর জন্য উচিত স্বামীর পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সুন্দর আচরণ করা আর মিল-সম্পৃতির সম্পর্ক বজায় রাখা। শশুর বাড়ির লোকজন থেকে কষ্ট পেলেও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। সবসময় স্বামীর কাছে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করা, তাদের ব্যাপারে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা স্বামীর অন্তর থেকে স্ত্রীর মুহাব্বাত কমিয়ে দেয়। ঘরে একাধিক নারী এবং একাধিক বাচ্চা থাকলে সবকিছু তো আর নিজের রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী হবে না। নিজের মন-মানসিকতার বিরোধী কিছু আচরণ কোথায় আর পাওয়া যায় না?! তাই মন খারাপ না করে শশুরবাড়ির লোকজনের সাথে ভালো আচরণ বজায় রাখবে। তাদের ছোটো-বড় সকলকে আন্তরিকভাবে মুহাব্বাত করবে। এতে জীবন আনন্দমুখর হয়ে ওঠবে। যিন্দিগীতে খুশির ফোয়ারা বইতে থাকবে।

(৮) স্ত্রী নিজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মনকাড়া রূপ অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষিত রাখবে। নষ্ট হতে দিবে না। এতে স্বামীর দৃষ্টি অন্য কিছু খুঁজবে না।

সন্তান জন্মদান

বিবাহের কিছুদিন পর সাধারণত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই এক পরম আনন্দের আগ্রহ জাগ্রত হয়। উভয়েই চায়, আল্লাহ যেন তাদেরকে সন্তান দান করেন। দুনিয়ার উপকরণে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী উভয়ের যৌনমিলনের মাধ্যমেই সন্তান দুনিয়াতে আসার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কখনো আল্লাহ তাআলা সন্তান শীঘ্রই দেন না। যাতে উভয়ের বিভিন্ন সমস্যা ছাড়াও আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার হস্তক্ষেপ থাকে। তাই সন্তান গর্ভধারণে দেরী হলে হতাশ ও নিরাশ হওয়া অনুচিত। মনোঃকষ্ট আর অন্তর্জালার কিছু নেই এতে। বরং আল্লাহর প্রতি আশা রেখে দুআ করতে থাকবে। আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করতে থাকবে। প্রয়োজন হলে বৈধ পন্থায় চিকিৎসাও করবে। হতে পারে, স্বামী বা স্ত্রী কারো সন্তান জন্মের স্বাস্থ্য ভালো না অথবা কোনো দুর্বলতা আছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসা করা গেলে বিলম্বে হলেও সন্তান অবশ্যই আসবে। এই বিলম্বে আল্লাহ কর্তৃক কোনো কল্যাণও লুক্কায়িত থাকতে পারে।

যদি সন্তানবিহীন অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যালোচনায় স্ত্রীর এমন কোনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা পাওয়া যায়-যা সন্তান জন্মদানের প্রতিবন্ধক আর স্বামীও সন্তানের জন্য অন্য কোনো বিবাহ করতে চায়, তাহলে ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে তার জন্য বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উভয় স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করা এবং সমতা বজায় রাখা আবশ্যক। স্ত্রীদের হক ও অধিকার আদায়ে যদি সামান্য পরিমাণও এদিক-সেদিক করা হয়, কোনো স্ত্রীর অধিকার আদায়ে একটু বেশি ঝোঁক দেখা দেয়, তাহলে ফলাফল শোচনীয় পর্যায়ের খারাপ হবে, কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে,

> “যার দু'জন স্ত্রী আছে। কিন্তু সে তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে। (অর্থাৎ তার বেশি যত্ন নিয়েছে) তাহলে কিয়ামাতের দিন সে একদিকে বাঁকা শরীর নিয়ে ওঠবে”[৩৫]।

সেদিন মানুষ তার শরীর দেখেই বুঝে নিবে যে, সে অপরাধী। স্ত্রীদের মধ্যে সে সমতা বজায় রাখেনি। তাই একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রেখে জীবন যাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নচেত কঠিন আযাবের মুখোমুখি হতে হবে।

উল্লেখ্য, স্বামীর জন্য সর্বদাই দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সাধারণত যেহেতু সন্তান না হওয়ার দরুন পরবর্তী বিবাহ করা হয়, তাই উপরে সন্তান না হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

(৩৫) হাদীসটি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ২১৩৩ জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং: ১১৪১।

গর্ভধারণ

আল্লাহ তাআলা কোনো দম্পতিকে সন্তানের নেআমত দান করলে, নেয়ামত আসার শুরুটাই হবে গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে। সন্তান গর্ভে আসলে বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। সবচেয়ে বড় নিদর্শন মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া। এছাড়া অনেক নারীর এ সময় বমি বমি ভাব হয়। কারো বমিও হয়।

সন্তান গর্ভে আসার এ সময়টাতে স্ত্রীর জন্য নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালি থাকার জন্য এবং রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন ধরণের শক্তিবর্ধক খাবার খাবে ও ঔষধ সেবন করবে।

এ সময়ে নারীদের সাধারণত বমি বমি ভাব হয়, মনোবল ভাঙ্গা থাকে, তাই বিভিন্ন সময়ে তারা চুকা এবং লবনাক্ত জিনিষ খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক নারী কালো মাটিও খেতে চায়। কিন্তু তারা কেবল ঐ সকল জিনিষই খাবে, যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উপকার বয়ে আনবে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবার থেকে পূর্ণাঙ্গ দূরত্ব বজায় রাখবে। খুব ঝাল এবং খুব চুকা জিনিষ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। গর্ভাবস্থায় লাফালাফি করা, দৌড়াদৌড়ি করা এবং প্রচণ্ড ভারি জিনিষ বহন করা থেকে বিরত থাকবে। নচেত গর্ভ নষ্ট হয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে গর্ভাবস্থায় পায়খানা কষা করে, এমন জিনিষ খাবে না। পায়খানা কষা হয়ে গেলে দ্রুত চিকিৎসা করবে। পাতলা পায়খানা সৃষ্টিকারী জিনিষ সমূহ থেকেও বেঁচে থাকবে। নারী এ সময় খুব বেশি হাসি-খুশি এবং আনন্দ মুখর হয়ে থাকবে। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং মানসিক যাতনা থেকে পূর্ণাঙ্গ রুপে বিরত থাকবে। কাপড়-চোপড় এবং ঘর-দোড় পরিস্কার রাখবে। অন্তর এবং মন-মানসিকতাও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। কারণ, কুদরতিভাবে নারীর এ সকল অবস্থার প্রভাব পেটে থাকা সন্তানের উপর পড়ে। তাই, এ সকল দিনগুলোতে মায়েদের চূড়ান্ত রকম পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি থাকা উচিত।

গর্ভের দিনগুলো স্ত্রী সঙ্গম থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত। বিশেষত গর্ভে আসার প্রথম চার মাস এবং গর্ভ ধারণের সাত মাস পরের সময়গুলোতে। নচেত গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। অবশ্য ইসলামী শরীয়ার নীতি অনুযায়ী পুরো সময়েই সঙ্গম করা বৈধ।

গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের ফযীলাত

গর্ভের সময়টা নারীদের অনেক কষ্টে কাটে। এই কষ্ট অল্প কিছুদিনের না, বরং প্রায় নয় মাসের বিশাল একটা সময়। এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের সময় হলো প্রসবকালীন কষ্ট। মায়েদের গুরুত্ব, তাদের বড়ত্ব এবং সম্মানের কথা বুঝাতে এই কষ্টগুলোর কথাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

حملته امه وهنا على وهن

> "কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তার মা তাকে পেটে বহন করেছে"।[৩৬]

অন্যত্র বলেন,

حملته أمه كرها ووضعته كرها

> "তার মা তাকে পেটে বহন করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসবও করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে"।[৩৭]

যে সন্তান জন্ম নিবে, সেও আল্লাহর বান্দা। তার সাহায্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মত বৃদ্ধি পাবে। এ সন্তান বড় হয়ে দ্বীনদার হবে। হক্কের পথের দাঈ হবে। এ সকল কারণেই হাদীসে সন্তান গর্ভধারণ এবং প্রসবের অনেক সওয়াব বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে তার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়ে একজন নারী সেই মুজাহিদের মতো, যে মুসলিম বাহিনী বা মুসলিম রাষ্ট্রে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত"[৩৮]।

---

[৩৬] (সূরা লুকমান, আয়াত নং: ১৪)

[৩৭] (সূরা আহকাফ, আয়াত নং: ১৫)

(৩৮) ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহর 'আল-মুজামুল আওসাতে' (৭/২০) এ ধরণের একটি হাদীস এসেছে। কিন্তু এটি বানোয়াট। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহর আল-মাউযুআত দ্রষ্টব্য, (২/২৭৪)

এ ধরণের মুজাহিদদের জন্য সওয়াব অনেক বেশি নির্ধারিত থাকে।
অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"প্রসবের সময় কোনো নারী মৃত্যুবরণ করলে সে শহীদ"[৩১]।

তাই গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের কষ্টগুলো নারীর জন্য হাসি-খুশিতে বরণ করে নেওয়া উচিত; কারণ এগুলো শুধু মানবিক চাহিদার পূরণই না। বরং এতে রয়েছে অনেক সওয়াব।

উল্লেখ্য, মু'মিনের প্রত্যেক বিপদেই আছে তার জন্য ফযীলাত এবং গুনাহ মাফের সুযোগ। মুমিনের উপর আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং; ৫৬৪১)

সে হিসেবে গর্ভবতী নারীদের গর্ভকালীন এই কষ্টের সময়কার সওয়াব অবশ্যই তার হবে। কিন্তু নির্ধারিত ঐ হাদীসটি বিশুদ্ধ না।

(৩১) সুনানু আবী দাউদের ৩১১১ নং হাদীসে এসেছে,

والمرأة تموت بجمع شهيدة

অর্থাৎ যে মহিলা প্রসবের সময় ইন্তিকাল করে, সে শহীদ। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (শরহু মুসলিম: ১৩/৬২)

বার্থ কন্ট্রোল বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা

অনেক সময় সন্তান বেশ কয়েকজন থাকে। বা আগের সন্তান দুধ পান করছে। বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য দুর্বল। অথবা এ জাতীয় কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রী চাচ্ছে, পরবর্তী বাচ্চা এখনই না হোক। বরং কিছুদিন পর হোক। ইসলামী শরীয়াহ এর জন্য বৈধ কিছু পন্থার ব্যবস্থা রেখেছে। যাতে স্বামীরও ক্ষতি নেই আর স্ত্রীরও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। যেমন, 'আযল' বা বীর্য বাহিরে ফেলা। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করবে। বীর্য নির্গত হওয়ার সময় হলে যৌনাঙ্গ বের করে ফেলবে; ফলে বীর্য স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভেতরে গড়াবে না।

এ ছাড়া এক চিকিৎসক বলেছেন, সঙ্গমের পরপর স্ত্রী উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে, বা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে হাঁটবে। এতেও বীর্য স্ত্রীর জড়ায়ুতে প্রবেশ করবে না; ফলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকবে না।

বর্তমানে গর্ভনিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কতকগুলোর দ্বারা সবসময়ের জন্য সন্তান গর্ভে আসার পথ রুদ্ধ করা হয়। এর দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত সক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। কিছু আছে এমন, যেগুলো দ্বারা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয় না। বরং কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়. যেমন, গর্ভ নিরোধক বিষাক্ত পিল খাওয়া, স্বামী কর্তৃক কাঠি ব্যবহার কবা। এ সমস্ত পদ্ধতি দ্বারা স্বামী-স্ত্রী কোনো একজনের ভয়াবহ ক্ষতি হয়ে যায়। স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। যে সকল স্বামী বা স্ত্রী এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, তারা নিজেদের স্বাভাবিক সুস্থতা খুইয়ে ফেলেছে।

সন্তান প্রসব

সন্তান প্রসবের সময় হয়ে গেলে অভিজ্ঞ কোনো ধাত্রিকে ডেকে এনে গর্ভবতীকে ঘরেই রাখবে; যাতে সেই অভিজ্ঞ ধাত্রি প্রসবের সময় সহ অন্যান্য বিষয়াদির বিশুদ্ধ অনুমান করতে পারে। এর সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কিছু জিনিষ রাখলে আরো ভালো।

আজকাল একটা ফ্যাশন প্রচলন পেয়ে গেছে। প্রসবের সময় হয়ে গেলেই স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যেহেতু সাধারণত অমুসলিম নার্স থাকে[৪০] বা পর্দাহীনতার চূড়ান্ত পর্যায় বাস্তবায়িত থাকে এবং পুরোপুরি ইসলামী পরিবেশ থাকে না, তাই প্রসবের এই সময়ে ঘরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পবিত্র এবং পর্দানশীন পরিবেশ বর্জন করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত না। অবশ্য যদি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে, গর্ভবতী নারীর কষ্ট হয় বা তার কোনো অসুস্থতা দেখা দেয় অথবা যথাসময়ে ভালো ধাত্রির ব্যবস্থা না হয়, তাহলে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

(৪০) লেখক যেহেতু ভারতীয়। সেখানকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি এটি বলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মুসলিম নামধারীদের মধ্যে এ সকল বিষয়ে শরীয়ার বিধি-বিধান পালনে খুব অবহেলা সর্বত্র মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ পরবর্তী করণীয়

(১) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপর তাকে পাক-পবিত্র করে, গোসল দিয়ে তার ডান কানে আযান দিবে। বাম কানে ইকামাত বলবে[৪১]।

(২) কোনো বুযুর্গ এবং নেককার ব্যক্তিকে দিয়ে বাচ্চার 'তাহনীক' করবে। অর্থাৎ বুযুর্গ মানুষ দিয়ে একটা খেজুর চিবিয়ে, নরম করে বাচ্চার মুখের তালু তথা উপরিভাগে লাগিয়ে দিবে। ফলে দুনিয়ায় আসার পর সর্বপ্রথম বাচ্চার পেটে যাবে একজন বুযুর্গ মানুষের থুথু এবং খেজুরের মিষ্টতা। এটা বাচ্চার জন্য অনেত বরকতময়[৪২]।

---

(৪১) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তার কানে আযান বলা সুন্নাত। গোসল না করিয়ে দেওয়া অনুত্তম। যদি কোনো কারণে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যানুযায়ী তখন গোসল করানো তার জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে আযান তখনই বলবে। গোসলের জন্য অপেক্ষা করবে না। (দারুল উলূম দেওবন্দ)

ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামাত বলবে। শিশুকে কোলে নিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে হাল্কা আওয়াযে তার কানে আযান এবং ইকামাত বলবে। সাহাবি আবূ রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মের পর তার কানে আযান বলছেন। (জামিউত তিরমিযী, হাদীস নং: ১৫১৩)

উমর ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহু শিশুর ডান কানে আযান বলতেন আর বাম কানে ইকামাত বলতেন। (মুসান্নাফু আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং: ৭৯৮৫)

শিশু ছেলে হোক আর মেয়ে, তার কানে আযান এবং ইকামাত বলা সুন্নাত। আমাদের দেশে কোথাও কোথাও প্রচলন আছে, মেয়ে শিশু হলে কানে আযান বলতে হয় না। এটা ভুল প্রচলন এবং ভুল বিশ্বাস। (হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন: ১/২৫৮, আহকামুল মাওলূদ ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৯৩)

কোনো পুরুষ না থাকলে নারীরাও শিশুর কানে আযান ও ইকামাত বলতে পারে- যদি সে মিনস এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে থাকে (ফতওয়ায়ে মাহমূদীয়া: ৫/৪৫৫, খাইরুল ফাতাওয়া: ২/২২৭, দারুল উলূম দেওবন্দের ওয়েবসাইট: উত্তর নং: ১৭৭৭০৪)

(৪২) সাহাবি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ মর্মে একটা হাদীস এসেছে। (সহীহু মুসলিম, হাদীস নং: ২১৪৪) আযান-ইকামাতের পর তাহনীক করবে।

(৩) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন বাচ্চার আকীকা করা সুন্নাত। যদি সপ্তম দিন সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তীতে বাচ্চার জন্মদিনের পূর্বের দিন আকীকা করবে। উদাহরণস্বরুপ, বুধবারে জন্মগ্রহণ করলে পরবর্তী কোনো মঙ্গলবারে তার আকীকা করবে[৪৩]।

ছেলে সন্তান হলে দুইটি ছাগল আর মেয়ে সন্তান হলে একটি ছাগল দিয়ে আকীকা করবে। ছেলের পক্ষ হতে একটি ছাগল দিয়ে করলেও আকীকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

(৪) আকীকার দিন মাথার চুল মুণ্ডন করে চুল সমপরিমাণ রুপা সদকা করা মুস্তাহাব[৪৪]। হাদীসে এটা করতে বলা হয়েছে।

চুল সহ অন্যান্য যে সকল জিনিষ মানুষের শরীর থেকে পৃথক করা হবে, সেগুলো কোনো পবিত্র স্থানে দাফন করে দেওয়া উচিত। যেখানে সেখানে ফেলে রাখা অনুচিত। এতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আশঙ্কা রয়েছে।

(৫) বয়স কম থাকতেই ছেলের খতনা করে নেওয়া উত্তম। বয়স বেশি হওয়ার অপেক্ষা করা অনুচিত।

(৬) বাচ্চাকে দোলনায় শোয়ানো, ভালো ও উপকারী গজল জাতীয় কিছু শুনানো যেতে পারে।

(৭) বাচ্চার সুন্দর অর্থবহ নাম রাখবে। আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান জাতীয় নাম এবং নবী, সাহাবিগণের নামানুসারে নাম রাখা অধিক উত্তম হাশরের ময়দানে সবাইকে তার নাম ধরে ডাকা হবে। খারাপ এবং মন্দ নাম হলে সেদিন অনেক লজ্জিত হতে হবে[৪৫]।

([৪৩]) তাবেয়ী আতা রহিমাহুল্লাহ্ থেকে এমন বর্ণিত আছে। (মুসান্নাফু আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং: ৭৯৬৯)

([৪৪]) ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান হলে তিনি নির্দেশ দিয়ে শিশুর মাথার চুল মুণ্ডাতেন এবং চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করতেন। বলতেন, 'আমার পিতা এটা করেছেন'। (মুসান্নাফু আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং: ৭৯৭৩)

([৪৫]) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের এবং তোমাদের বাবার নামে। সুতরাং তোমরা সুন্দর নাম রাখবে"। (সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং: ৪৯৪৮)

সন্তানের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সবর

আল্লাহ তাআলা কখনো সন্তান দিয়ে আবার নিয়ে নেন। এটা বাস্তবিকই অনেক বড় একটি আঘাত। কিন্তু এমন মুহূর্তে সবরের প্রয়োজন অনেক বেশি। নিজেকে প্রচুর কন্ট্রোলে রাখা আবশ্যক। চক্ষুযুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এবং অন্তরে খুব বেশি ব্যথিত হওয়া তো মানুষের নিতান্তই স্বভাবজাত। কিন্তু কোনোভাবেই মুখ থেকে আল্লাহর শানে বেয়াদবী মূলক কিছু বলা যাবে না। অন্তরেও অন্যায় কোনো ধারণা-বিশ্বাস রাখা যাবে না। বরং অত্যন্ত প্রকটভাবে সবর করতে হবে। বিনিময়ে পরকালীন সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখতে হবে। হাদীসে নাবালেগ সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী নারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। দুই বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এক সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী নারীর জন্যও জান্নাতের প্রতিশ্রুতির কথা হাদীসে পাওয়া যায়[৪১]। তাই সন্তানের মৃত্যুর এই সময়গুলোতে ধৈর্যহীন হয়ে জান্নাতের সুসংবাদকে হাতছাড়া করা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। বরং দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধরে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

(৪১) সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ১১৯১। ফাতহুল বারী: ৩/১৪২।

দুধপান করানো

(১) বাচ্চার জন্য সবচেয়ে উপযোগী, তার মায়ের দুধ। তাই তার মা কর্তৃক তাকে দুধ পান করানোই সর্বাধিক উত্তম। কিন্তু যদি কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে, অথবা তার মায়ের দুধ ভালো না থাকে, তাহলো দুধ পান করানোর জন্য কাউকে নির্ধারণ করে নিবে।

(২) স্তন্যদানকারিনী নারীও তার মায়ের মতো অশুভ খেয়াল এবং অন্যায় কল্পনা থেকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ, দুধ পানের সময়ও স্তন্যদানকারিনীর রুচি-অভিরুচি, মন-মানসিকতা এবং আখলাক-চরিত্র সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে থাকে।

(৩) স্তন্যদানকারিনী নিজের সুস্থতার পূর্ণাঙ্গ যত্ন নিবে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে ভালো ভালো খাবার গ্রহণ করবে। এতে বাচ্চার শক্তি ও শরীরের উপর সেই খাবারের প্রভাব পড়বে।

সন্তান প্রতিপালন

যখন বাচ্চা কিছুটা বুঝতে শুরু করবে, তখন তাকে আল্লাহর নাম এবং কালিমায়ে শাহাদাত শেখানোর চেষ্টা করবে। অসংলগ্ন কোনো আচরণ তার সামনে করবে না। ভুল কিছু তার থেকে প্রকাশ পেলে সবসময় তাকে সেই ভুল থেকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। হালাল উপার্জনের পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করবে। বাবা-মা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ ও সংশোধনের দুআ করতে থাকবে। তার শিক্ষা-দীক্ষার পরিপূর্ণ যত্ন নিবে। এ বিষয়ে উদাসীনতার কোনো সুযোগ নেই। মায়ের কোলই তার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। তাই এখানেই তার চরিত্র উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে।

পরিবার-পরিজনের শিক্ষা-দীক্ষার সবচেয়ে সহজ একটি পদ্ধতি বর্তমানে অনুসরণ করা যায়। অর্থাৎ ঘরে রেডিও, টেলিভিশন রাখার পরিবর্তে দ্বীনি বইসমূহ গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা। পরস্পরে বিভিন্ন মাসআলা আলোচনা করা। বিভিন্ন অবস্থা আর সময়ের দুআ শেখানো। দৈনন্দিন নির্ধারিত একটা সময় গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করা আর তাসবীহ পাঠের ব্যস্ততা বানানো। এভাবেই ঘর-ই একটি পারিবারিক মাদরাসা আর খানকাহের রূপ নিবে। ফলে গৃহবাসি সবাই সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

সন্তানের উপর মা-বাবার হক

বাচ্চা যখন বুঝ সম্পন্ন হয়, তখন থেকেই তার উপর মা-বাবার বিভিন্ন হক ও অধিকার আবশ্যক হয়ে যায়। শিশুকালে মা-বাবা চূড়ান্ত পর্যায়ের কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করে, অত্যন্ত মুহাব্বাত আর মমতার সাথে তাকে প্রতিপালন করেছে। মা শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে থাকে, তবুও সবচেয়ে বেশি কষ্ট তারই সহ্য করতে হয়েছে। কুরআনেও তার কষ্ট সহ্যের কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকে তার অধিকার সমূহের মহত্ব আর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বাবা-মায়ের অবাধ্যতা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে পরিগণিত হয়। এক হাদীসে দেখা যায়, কুফর-শিরকের পর সবচেয়ে ভয়াবহ গুনাহ বাবা-মায়ের অবাধ্যতাকে নির্ণয় করা হয়েছে।

বাবা-মায়ের আনুগত্যের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলোতে দেখা যায় বাবা-মায়ের আনুগত্যের কারণে উপার্জন এবং কাজ-কারবারে বরকত হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ পাওয়া গেছে। আরো দেখা গিয়েছে, তাদের অবাধ্যতার দরুন বঞ্চনা আর বিফলতা ঘটতে এবং পরকালে শাস্তি অবধারিত হতে। নিম্নে দুয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

বনু ইসরাইলের তিন ব্যক্তির ঘটনা

বনু ইসরাইলের তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে প্রচণ্ড রকম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো। ঘটনাক্রমে প্রচণ্ড বড় একটি পাথর গুহার মুখে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিলো। ফলে তাদের বের হওয়ার সকল রাস্তা রুদ্ধ হয়ে গেলো। তারা সুনিশ্চিত মৃত্যু নিজেদের সামনে দেখতে লাগলো। তিনজন মিলে তখন সিদ্ধান্ত করলো, তারা প্রত্যেকে নিজেদের কোনো গ্রহণযোগ্য আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবে; এতে মুক্তির কোন পথ মিলে যেতে পারে।

তাদের মধ্যে একজন দুআ করলো, হে আল্লাহ আপনি জানেন, আমি ছাগল চড়াতাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসায় এসে দুধ দোহন করে প্রথমে আমার মা-বাবাকে দুধ পান করাতাম। এরপর সন্তানদেরকে পান করাতাম। একবার

সন্ধ্যাবেলা আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেলো। এসে দেখলাম, আমার মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুধ দোহন করতে দেখে বাচ্চারা দুধ চাইতে ছিলো। আমি বললাম, আমার মা-বাবা দুধ পান করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে পান করাবো না। মা-বাবা ঘুমিয়ে থাকার কারণে তাদেরকে জাগ্রত করা সমীচীন মনে করিনি। তাই, দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশা ছিলো, তারা জাগ্রত হলে প্রথমে তাদেরকে পান করাবো, এরপর বাচ্চাদেরকে। ওদিকে বাচ্চারা চিৎকার করছিলো, কিন্তু আমি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি। এভাবে ভোর হয়ে গেলে তারা ঘুম থেকে ওঠে প্রথমে পান করলো। এরপর বাচ্চারা।

হে আল্লাহ, আমার এই কর্মের ওসীলায় আপনার কাছে দুআ করছি, আপনি আমাদের জন্য কোনো পথ বের করে দিন। ফলে, পাথর কিছুটা সরে গেলো এবং গুহায় বাতাস আসা শুরু হলো। কিছুটা আলোকিতও হলো। কিন্তু বের হওয়ার ব্যবস্থা তখনও হলো না। পরবর্তীতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন তাদের নেক আমলের ওসীলায় দুআ করলে পাথর পুরোপুরি সরে গেলো। তাদের বের হওয়ার রাস্তা হয়ে গেলো।

মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীর ঘটনা

মূসা আলাইহিস সালাম একদিন দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, জান্নাতে আমার সঙ্গী কে হবে? আমাকে জানিয়ে দিন"। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানালেন, অমুক স্থানে এমন একজন ব্যক্তি আছে। তুমি তাকে দেখে নাও।

মূসা আলাইহিস সালাম খুঁজে তাকে পেলেন। জানতে পারলেন, তার মা একজন বৃদ্ধা। প্যারালাইসিস আক্রান্ত। হাঁটা-চলা এবং নড়াচড়া করতে অক্ষম। লোকটি একজন শ্রমিক। দৈনিক দু' বেলা এসে নিজ হাতে লুকমা তুলে মাকে খাইয়ে দেয়। মায়ের সেবা করে। মা তার সেবায় খুশি হয়ে দুআ করেন, "প্রিয় ছেলে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী বানিয়ে দেন"।

মায়ের অসন্তুষ্টিতে মৃত্যুকালে কালিমা জুটবে না

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক যুবক মৃত্যু শয্যায় উপনীত হলো। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে কালিমার তালকীন করতে লাগলেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন, তার মা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তাই তার মাকে ডেকে তাকে বললেন, "তুমি কি চাও, তোমার সন্তান জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকুক?" মহিলা বললো, না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে তোমার ছেলে যেই ভুলই করেছে, তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও"। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে মা তার সন্তানকে ক্ষমা করে দিলো। সাথে সাথে সেই যুবকের মুখ থেকে কালিমা উচ্চারিত হলো।

এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তানের মৃত্যুকালে কালিমা তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে না।

প্রশ্ন-উত্তর

বিয়ে-শাদী সম্পর্কে অনেক বন্ধু অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছেন। কিছু বিষয় এমন ছিলো, প্রশ্ন-উত্তর আকারে যেগুলো সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করলে উপকার হবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাই প্রশ্ন-উত্তর আকারে এখানে সেসব উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: যুবকের বিবাহের প্রচণ্ড প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু আর্থিক সক্ষমতা নেই, তাহলে সে কী করবে?

উত্তর: এমন ব্যক্তির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক বেশি রোযা রাখতে বলেছেন। এতে ইনশাআল্লাহ, চাহিদার তীব্রতা কমে যাবে। অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

উল্লেখ্য, রোযা রাখতে হবে অল্প খেয়ে। পেট কিছুটা খালি রেখে। এতে রোযার ফলাফল পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন: নন-মাহরাম নিকটাত্মীয়াকে বিয়ে করা কি জায়েয?

উত্তর: নন-মাহরাম নারীদেরকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই। নিকটাত্মীয় হলেও সমস্যা নেই। যেমন, চাচাত বোন, মামাত বোন।

প্রশ্ন: ফুলসজ্জার সময়ে নির্ধারিত রুম খুব করে সাজানো হয়। মন-দিল খুলে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। এটা কি সঠিক?

উত্তর: অপচয় এবং অপব্যয় হারাম। অবশ্য সামান্য সাজসজ্জা এবং সৌন্দর্য করতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: এনগেইজ হওয়ার পর বিবাহের আগে কনের সাথে বর কি দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে? কথা-বার্তা বলতে পারবে?

উত্তর: শুধু বিবাহের উদ্দেশ্য কোনো মেয়েকে দেখা যেতে পারে। পছন্দ হলে বিবাহ চূড়ান্ত করে ফেলবে। এরপর বিবাহ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বারবার দেখা না-জায়েয। বিবাহ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে নন-মাহরাম এবং শরীয়ার দৃষ্টিতে অপরিচিতাই থাকবে। তাই তার সাথে সম্পর্ক তৈরী করা, দেখা-সাক্ষাৎ করা না-জায়েয বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: প্রসব যন্ত্রণার সময় হাসপাতালে/ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া কেমন হবে?

উত্তর: যদি অসুস্থ হয়ে যায় বা ঘরে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে বা দেখভালের জন্য কেউ না থাকে অথবা ঘরে প্রসব হলে বাচ্চা বা মায়ের খুব কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে হাসপাতাল/ক্লিনিকে নিয়ে যেতে কোনো সমস্যা নেই। প্রয়োজন ছাড়া অযথা নিয়ে যাওয়া অনুচিত।

প্রশ্ন: কোনো কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থায়ীভাবে গর্ভ নিরোধ করা কি জায়েয?

উত্তর: স্থায়ীভাবে গর্ভবতী হওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার করা না-জায়েয। 'আযল' করা বা সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার জায়েয আছে শর্ত হলো এর দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকতে হবে[৪৭]।

---

(৪৭) এ বিষয়ে বইতে আলোচনা করা আছে।

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীর উপর নারায এবং অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে কি তাকে তালাক দিয়ে দিবে?

উত্তর: তালাক চরম উপায়হীনতার একটি স্তর। প্রথমে মিল করার চেষ্টা করবে। ঝগড়া খুব বেশি হলে কাউকে দিয়ে সন্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এতেও কাজ না হলে, অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করে চরম উপায়হীনতার মুহূর্তে তালাকের পথে আগাবে। নচেত শুধু অপদস্ততা আর হতাশাই জুটবে।

প্রশ্ন: দিনে স্ত্রী সঙ্গম করলে কি সমস্যা? প্রচুর পরিমাণে সঙ্গম করলেই বা কী সমস্যা?

উত্তর: রাতে যেমন স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েয। ঠিক তেমনি দিনের বেলা স্ত্রী সঙ্গম করাও জায়েয।

স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হলে, প্রচুর পরিমাণে সঙ্গম করতে কোনো সমস্যা নেই। অধিক পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ সঙ্গম করার ক্ষেত্রে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খুব বেশি যত্ন নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করার সময়সীমা কতদিন?

উত্তর: ১৫ দিনে একবার করবে। ৪০ দিন সর্বশেষ সীমা। এরপর বিলম্ব হলে গুনাহ হবে।

প্রশ্ন: নাভীর নিচের লোম পরিস্কার কীভাবে করবে?

উত্তর: প্রচলিত যে সকল যন্ত্র (রেজার) দিয়ে লোম পরিস্কার হয়ে যায়, সেগুলো দিয়ে পরিস্কার করতে কোনো সমস্যা নেই।

নারীরা লোম পরিস্কারের জন্য চুনা, পাউডার বা লোম নাশক ক্রিম ব্যবহার করবে।

প্রশ্ন: পরিস্কার করা লোমগুলো কোথায় ফেলবে?

উত্তর: লোমগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলবে। এদিক-সেদিক ফেলবে না।

প্রশ্ন: নারীরা মাথার চুল কতটুকু বড় রাখবে? তাদের জন্য একেবারে মুণ্ডন করা কি জায়েয?

উত্তর: নারীদের জন্য মাথার চুল বড় করা আবশ্যক। এটা তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাই, তাদের জন্য মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছোটো করা জায়েয নেই[৪৮]। পুরুষদের মতো চুল রাখা আরো বড় গুনাহ।

প্রশ্ন: চুল আঁচড়ানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর: হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথার চুল আঁচড়াতেন, তখন প্রথমে ডান পাশের চুল আচড়াতেন। এরপর বাঁ পাশের। মাথার মধ্যখান বরাবর সিঁথি কাটতেন। এটাই সুন্নাহ।

প্রশ্ন: নারীরা কি চুল খোলামেলা রাখতে পারবে?

উত্তর: নারীদের চুলও তাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত। চুল গোপন রাখাও তাদের জন্য আবশ্যকীয় পর্দা। তাই ওড়না ইত্যাদি এমনভাবে মাথায় রাখবে, যাতে চুল খুলে না যায়, চুল দেখা না যায়। নচেত কঠিন গুনাহ হবে।

সংযোজন

মূল বইয়ের অনুবাদ শেষ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিশিষ্ট সংযোজন করা হচ্ছে।

(৪৮) বিশেষ কোনো সমস্যা হলে সেটার কথা ভিন্ন।

পরিশিষ্ট নং ১

পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব[৪৯]।

মাওলানা আফফান মানসূরপূরী দামাত বারাকাতুহুম।

পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের মৌলিক একটি দায়িত্ব হলো, সন্তানদের জন্য ইসলামী পরিবেশের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দ্বীনি শিক্ষার সুন্দর আর উপকারী পন্থার ব্যবস্থা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচার শিখানো, আল্লাহর রাস্তায় এক সা' পরিমাণ সদকা করার চেয়ে অধিক উত্তম"[৫০]।

সদকা করার চেয়ে এটা অধিক উত্তম; কারণ সদকা তো পরেও করা যাবে। কিন্তু সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর যে সময়, যদি তখন এটার ব্যবস্থা না করা হয় এবং সন্তানের রুচি আর মেজাজ গঠনের চেষ্টা করা না হয়, তাহলে পরবর্তীতে ইচ্ছা থাকলেও বিশুদ্ধভাবে শিষ্টাচার শেখানো এবং দীক্ষিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লামা মুনাবী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচার ও আদব-কায়দায় অবগত করানো, তাদেরকে সালেহ ও নেককার বানানোতে সফল হওয়া এক প্রকারের সদকায়ে জারিয়া বা সদা চলমান সদকা। পক্ষান্তরে এক সা' পরিমাণ সদকা করার সওয়াব সদা চলমান থাকবে না। বরং একসময় শেষ হয়ে যাবে'।

মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচারে অভ্যস্ত না করালে মানুষ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সদকা না করলে শাস্তি হওয়ার কিছু নেই'। তাই, সদকা করার তুলনায় সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করানোর সওয়াব বেশি বলা হয়েছে হাদীসে।

---

(৪৯) প্রবন্ধটি ভারতের জামিয়া কাসিমিয়া মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদের মাসিক পত্রিকা 'নেদায়ে শাহী' তে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১ এর অক্টোবর সংখ্যায়।

(৫০) সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯৫১।

পিতা-মাতার পক্ষ হতে সর্বোত্তম গিফট

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ হতে সর্বোত্তম গিফট ও উপঢৌকন কী? এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পিতা-মাতার পক্ষ হতে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম গিফট হলো, তাদেরকে উন্নত আর সুন্দর চরিত্রে অভ্যস্ত করানো"[৫১]।

হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'শিশুকালে কোনো কিছু শেখা, পাথরে খোদাই করার মতো স্থায়ী'।

লুকমান হাকীম রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'পিতা কর্তৃক সন্তানকে প্রহার করা ঠিক তেমন উপকারী, যমীনের জন্য বৃষ্টির পানি যেমন উপকারী'।

আলেমগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্তানকে শিশুবস্থায় ইসলামী শিষ্টাচারে অবগত করাবে, অভ্যস্ত করাবে, সন্তান বড় হলে তার চক্ষু শীতল করবে'[৫২]।

আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করো। তাদেরকে ইসলামী শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করাও'[৫৩]।

দুনিয়ার আকর্ষণ যেন বৃদ্ধি না পায়

বড় বড় ব্যক্তিগণ সন্তানের ইসলামী শিষ্টাচারে শিশুকালেই অভ্যস্ত করানোর এই গুরুত্ব এমনিতেই দেননি। তারা দূরদর্শী ছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, দুনিয়া মানুষের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, তারা দুনিয়া ব্যতিত আর কিছু দেখতে পাবে না। দুনিয়া-ই প্রতিটি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে। সর্বক্ষেত্রেই যখন দুনিয়াকে অগ্রগামী রাখতে চাইবে, তাদের চিন্তা-চেতনায় দ্বীন-ধর্ম তখন পরাজিত হয়ে যাবে। দুনিয়া ধর্মের উপর

---

(৫১) প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ১৯৫২।

(৫২) গিযাউল আলবাব ফী শরহি মানযুমাতিল আদাব: ১/৩৪৬

(৫৩) তুহফাতুল মাউলূদ, পৃষ্ঠা: ২২৯।

বিজয়ী হয়ে যাবে। অথচ আখেরাতের জীবন দুনিয়ার জীবনের তুলনায় অনেক উত্তম, অনেক বেশি স্থায়ী। দুনিয়াতে শান্তিতে থাকার জন্য, দুনিয়া নিয়েও চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। কিন্তু শুধুই দুনিয়ার চিন্তা থাকবে, আখিরাতের মোটেও চিন্তা থাকবে না- এমনটা মুসলমান করতে পারে না। মুসলমানরাও যদি এমন করে, তাহলে তাদের আর অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? দুনিয়ার এই আসক্তির আশংকা করেই তারা শিশু থাকাবস্থাতেই সন্তানের মন-মস্তিষ্কে ধর্মের বিষয়াদী বসিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পিতা-মাতার দায়িত্ব

পিতা-মাতার উপর সন্তানের ৩টি অধিকারের কথা একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

১. বাচ্চা জন্ম গ্রহণের পর তার সুন্দর একখান নাম রাখবে। অর্থবহ নাম রাখবে। এমন নাম রাখবে, যেটাতে আল্লাহর বান্দা হওয়া প্রকাশ পায়, যেটা নবীগণের নাম হয়, কোনো সাহাবির নাম হয়, কোনো নারী সাহাবির নাম হয়। রাসূলের কোনো আশেকের নামে নাম রাখবে।

বর্তমানে নতুন নতুন নাম রাখার একটা ফ্যাশন শুরু হয়ে গেছে। এমন নাম খুঁজতে থাকে, দুনিয়াতে যেটা কারো নামই না হয়। সব মানুষই এমন খোঁজা শুরু করে দিয়েছে, আখের এত নতুন নাম কোথায় পাওয়া যাবে? পুরাতন নাম এখন মানুষ রাখতেই চায় না। অথচ আমাদের লক্ষ্য তো নামের বাহ্যিক রুপ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো নামের অর্থ আর মর্ম। নতুন নাম অন্বেষণের চিন্তায় কখনো এমন নাম রেখে দেওয়া হয়, বছর কয়েক পর যে নাম পরিবর্তন করা লাগে। পরে কাউকে জিজ্ঞেস করে যখন দেখে, কারো নামের অর্থ পোকা-মাকড়, কারো নামের অর্থ বিযাক্ত বা ক্ষতিকর প্রাণী, তখন নাম না পাল্টিয়ে আর কোনো উপায় থাকে?! ইন্টারনেট থেকে কিছু নাম পছন্দ হলে রেখে দিলো, পরবর্তীতে অনুসন্ধানে জানা গেলো, নামের অর্থ অসুন্দর, তখন পাল্টানো লাগে। তাই, শুরু থেকেই ভেবেচিন্তে সুন্দর অর্থবহ কোনো নাম রাখবে।

২. যখন সন্তানের বুঝ-বুদ্ধি হয়, তখন তাকে কুরআন মাজীদ পড়াবে। যখন সন্তান নিজের ভালো-খারাপ বুঝতে শুরু করে, তখন তাকে কুরআন মাজীদ পড়াবে এবং দ্বীনের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস আর মাসআলা-মাসায়েল শিখাবে।

৩. সন্তান যখন বালেগ হবে, বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য বিয়ের চিন্তা করবে। সময়মতো বিয়ে হয়ে গেলে সমাজ অনেক অশ্লীলতা আর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে. অযথা বিয়েতে বিলম্ব হওয়ার দরুন সমাজে অনেক পাপ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বর্তমানে যুবকদের মধ্যে ব্যাপক বিচ্যুতি আর অন্যায় প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ, অযথা বিয়েতে বিলম্ব হওয়া। আর বিয়েতে বিলম্ব হওয়ার কারণ হলো, সমাজে প্রচলন পাওয়া বিয়ে সংক্রান্ত রুসম আর কু-সংস্কার। এই তিনটি বিষয়কে হাদীসে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে, "বাবার উপর সন্তানের হক্ব ও অধিকার তিনটি। (ক) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার সুন্দর নাম রাখা। (খ) বুঝ-বুদ্ধি সম্পন্ন হলে তাকে কুরআন মাজীদ শিখানো। (গ) উপযুক্ত হলে তাকে বিয়ে করানো"[৫৪]।

সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা না দেওয়ার পরিণতি

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে একব্যক্তি নিজের যুবক ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে আসলো। ছেলের সম্পর্কে অনেক বড়সড় অভিযোগ করে বললো, 'সে আমার নাকে দম এনে ছেড়েছে। আমার অবাধ্যতায় কোনো ত্রুটি করে না। আমার কোনো কথা মানতেও রাজি না। নিরুপায় হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি তাকে শস্তি দিন বা তাকে বুঝিয়ে দিন'। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি তোমার পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহকে ভয় পাও না? ছেলে বললো, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে দিবো। আগে আপনি আমার একটা জিজ্ঞাসার সমাধান দিন। বলুন তো, বাবার উপর কি আমার কোনো হক্ব আছে? না সব হক্বই আমার উপর? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার বাবার উপরও তোমার কিছু হক আছে।

---

(৫৪) তাম্বীল গাফেলীন বি-আহাদীসি সাইয়িদিল মুরসালীন, ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী কৃত, পৃষ্ঠা: ১৩০। অনেকে এ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।

১. প্রথমত, একজন ভালো আর নেককার নারীকে বিয়ে করা। যাতে সেই নারীর কোলে পরিপালিত সন্তানের মধ্যে ধর্মীয় বোধ-আকর্ষণ জাগ্রত হয়।

২. দ্বিতীয়ত, জন্মের পর সন্তানের ভালো নাম রাখা।

৩. তৃতীয়ত, সন্তান যখন বুঝ-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে শুরু করবে, তখন তাকে কুরআন পড়া শেখানো, দ্বীনের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস আর মাসআলা-মাসায়েল শেখানো।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে যুবক ছেলে বললো, আমার বাবা আপনার সামনেই বিদ্যমান। তাকে জিজ্ঞেস করুন তো, তিনি এই তিন হকের কোনোটা পালন করেছেন কি না?

প্রথমত, তিনি আমার মা হিসেবে কোনো দ্বীনদার নারীকে নির্বাচন করেননি। বরং বিয়ের জন্য এমন এক নারীকে চয়েজ করেছেন, যে দ্বীনের ব্যাপারে একেবারেই শূন্য। তার প্রতিপালনে থেকে আমার মধ্যে দ্বীনের রুচি-অভিরুচি কীভাবে তৈরি হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, তিনি আমার নাম রেখেছেন 'জুউল'। যার অর্থ ময়লার পোকা। ভালো নাম রাখার পরিবর্তে আমার রাখাই হয়েছে যখন এই নাম, তখন আমি ভালো কী করে হবো?

তৃতীয়ত, আমাকে কুরআন শেখানো তার দায়িত্ব। আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য বানিয়ে বলছি, তিনি আমাকে কুরআনের একটি আয়াতও শিখাননি। এবার আপনিই বলুন, যদি আমার পক্ষ হতে অবাধ্যতা পাওয়া যায়, তাহলে এই দায়ভার কি আমার উপর না তার উপর?

সন্তানের কথা শুনে ভরা মজলিসে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবাকে রাগ করলেন। এরপর বললেন, 'তুমি আমার কাছে এসে বলছো আমার ছেলে আমার অবাধ্যতা করে। সে তোমার অবাধ্যতা করার পূর্বেই তো তুমি তার অবাধ্যতা করেছো! যাও আমার এখান থেকে'[৫৫]।

---

(৫৫) শায়খ আব্দুল্লাহ মা'রুফী কৃত আল-আদাবুল মুফরাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আদ-দুররুল মুনাযযাদ: ১/৪০৫

মূলত, এক হাতে কখনো তালি বাজে না। যখন অন্যের হক আর অধিকার আদায় করা হবে, তখন তার থেকে নিজের হক্কও নেওয়া যাবে। আমরা যদি অন্যের হক্ক আদায় না করি, তাহলে আমরা কীভাবে তাদের থেকে এই আশা করতে পারি যে, তারা আমাদের হক্ক আদায় করবে। পিতা-মাতার আনুগত্য করা অবশ্যই সর্বাবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব। কিন্তু কথা হলো, সন্তানের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ আসার ব্যবস্থা পিতা-মাতাকেই করতে হবে। দায়িত্ববোধ আর যিম্মাদারী পালনের মানসিকতা সন্তানের মধ্যে সেই পরিবেশ থেকেই তৈরি হবে, যে পরিবেশে এই দায়িত্বের কথা আলোচিত হয়। যে পরিবেশে কুরআনের আয়াত দ্বারা তাদেরকে এই দায়িত্ব বুঝানো হয়। এই দায়িত্ব পালন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনানো হয়। সন্তান নিজের পরিবেশে বড়দের সাথে ছোটোদের আচরণ আর ছোটোদের সঙ্গে বড়দের আচরণ দেখে শিক্ষালাভ করে। পরিবেশের আচার-আচরণ সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে শুরু করে। তাই, সন্তানের জন্য দ্বীনি পরিবেশের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। নয়তো তারাও নিজেদের হক্ক না পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

এক বুযুর্গ সন্তানকে সরাসরি কোনো কাজের আদেশ করতেন না। কখনও প্রয়োজন হলে যদি বুঝতে পারতেন যে, সন্তান নাও মানতে পারে, তখন সরাসরি সন্তানকে আদেশ করতেন না। অন্য কাউকে আদেশ করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সন্তান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে কেন আদেশ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তাকে বলি আর সে না মানে, তাহলে তো সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে- এই আশংকায় আমি তাকে বলি না। আমার কারণে আমার সন্তান জাহান্নামের উপযুক্ত হোক, এটা আমি চাই না[৫৬]।

(৫৬) প্রাগুক্ত" ১/৫০৫

এই ঘটনায় পিতা-মাতা আর সন্তান উভয় শ্রেণীর জন্যই নির্দেশনা রয়েছে। সন্তানের জন্য এই নির্দেশনা আছে যে, সর্বাবস্থাতেই পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। আর পিতা-মাতাকেও বুঝানো হচ্ছে যে, তাদের দায়িত্ব সর্বদা সন্তানের জন্য স্নেহ আর দয়ার আচরণ করা।

সৌভাগ্যের নিদর্শন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদে দেখা যায়, মানুষের সৌভাগ্যের নিদর্শন চারটি। অর্থাৎ চারটি জিনিষ যার থাকবে, বুঝতে হবে সে সৌভাগ্যবান।

১. নেককার স্ত্রী। যে নেককার স্ত্রী পাবে, সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। নেককার স্ত্রী স্বামীকেও নেককার বানিয়ে ফেলবে। তার জীবনের ভালো প্রভাব স্বামীর জীবনে অবশ্যই পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুনিয়ার জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী"। তাই, তিনি বিয়ের পাত্রি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতা দেখার কথা সর্বাগ্রে বলেছেন। সৌন্দর্য, বংশ, সম্পদ সহ অন্যান্য বিষয় দেখতে বলেছেন পরবর্তী ধাপে; কারণ সফলতার চাবিকাঠি এই দ্বীনদারিতা-ই। আজকাল তো এ বিষয় পুরোই উল্টো হয়ে গিয়েছে। দ্বীনদারি দেখাই হয় না। সৌন্দর্য, বংশ আর সম্পদ দেখার পিছনেই মানুষ ঘুরঘুর করতে থাকে। দ্বীনদারির খবরই রাখে না।

২. ভালো ও নেক সন্তান। এটাও মানুষের সৌভাগ্যের নিদর্শন। এটা এমন বড় সম্পদ, পুরো জীবন এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করলেও কৃতজ্ঞতা সম্পূর্ণ হবে না।

৩. সৎ ও ভালো বন্ধু-বান্ধব। একজন মানুষ যাদের সাথে চলে, যাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, যাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, যদি তারা সকলেই দ্বীনদার হয়, নেককার হয়, তাহলে সে কত বড় সৌভাগ্যবান, ভাবা যায়?!

৪. স্বদেশেই উপার্জনের ব্যবস্থা হওয়া। এটাও ব্যক্তির সৌভাগ্যের নিদর্শন। যেখানে তার আত্মীয়-স্বজন থাকে, যেখানে বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জনের বসবাস,

সেখানেই যদি উপার্জনের সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে তার সৌভাগ্যের মাত্রা কী মাপা যায়?!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে সংক্ষেপে বলেন, "ব্যক্তির সৌভাগ্য চারটি জিনিষে। (ক) স্ত্রী নেককার হওয়া। (খ) সন্তানগণ নেককার হওয়া (গ) বন্ধু-বান্ধব সৎ ও নেককার হওয়া। (ঘ) স্বদেশেই উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া"[৫৭]। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সবকটি দান করেন।

(৫৭) প্রাগুক্ত: ১/৪০৬।

পরিশিষ্ট নং ২

২. দাম্পত্য জীবনে 'ইহসান'[৫৮]

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম

হযরত ডক্টর আব্দুল হাই আরিফী রহিমাহুল্লাহু আমাদের সময়কার ঐ সকল সমুজ্জল ব্যক্তিদের একজন, যারা প্রসিদ্ধি, পাবলিসিটি আর প্রচার-প্রকাশ থেকে নিজেকে এড়িয়ে জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর কর্মমুখর জীবনের সুগন্ধি নিজে নিজেই মানুষের অন্তরসমূহকে আকর্ষণ করতো, টেনে নিতো এবং আশপাশকে সুবাসিত করে দিতো। তিনি হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহুর দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাসাওউফ ও সুলুকের ক্ষেত্রে তাঁর খলীফা ছিলেন। এজন্যই মানুষ নিজেদের আমল ও আখলাক-চরিত্র সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে যেত এবং তাঁর দিক-নির্দেশনায় উপকৃত হতো।

একবার এক ব্যক্তি ডক্টর সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থা বলছিলো। একপর্যায়ে বললো, 'হাদীসের পরিভাষায় যে স্তরকে ইহসান বলা হয়, আলহামদুলিল্লাহ আমার সেই স্তর অর্জিত হয়েছে'।

আরিফি সাহেব তার উত্তরে তাকে অভিবাদন জানালেন। এরপর বললেন, 'বাস্তবেই ইহসানের স্তর অনেক বড় নিআমত। ইহসানের স্তর অর্জিত হলে কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। কিন্তু আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আপনার এ স্তর কি শুধু নামাযের ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়েছে? না কি আপনি যখন স্ত্রী-সন্তান বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোনো আচরণ করেন, তখনও আপনার অন্তরে সেই স্তরের বোধ জাগ্রত থাকে?'

---

(৫৮) প্রবন্ধটি মাসিক আল-বালাগের ১৪৪১ হিজরীর রবীউস সানী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের ওয়েবসাইটেও আছে।

জবাবে লোকটি বললো, 'আমি তো এটাই শুনেছি যে, ইহসানের সম্পর্ক শুধু নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের সঙ্গে। তাই নামাযেই আমি এটার চর্চা করেছি। আল্লাহর কৃপায় নামাযের ক্ষেত্রে আমার এই চর্চা সফল হয়েছে। কিন্তু নামাযের বাহিরে অন্যান্য লেনদেন, আচার-আচরণে কখনো ইহসান চর্চা করার চিন্তাই আসেনি'।

আরিফি সাহেব রহিমাহুল্লাহু বললেন, 'আমি আপনার এমন ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্যই আপনার কাছে জানতে চেয়েছি। নামায ও অন্যান্য ইবাদতে অবশ্যই এই চিন্তা রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন শুধু নামাযেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এটার প্রয়োজনীয়তা সমানহারে আবশ্যকীয়। মানুষদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার সময় এবং বিভিন্ন লেনদেন বাস্তবায়নের সময়ও এই চিন্তা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন হয়ে থাকে যে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তারা একজন অন্যজনের সঙ্গী হয়ে থাকে, তাদের জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই এসে থাকে, অনেক মনোমালিন্যতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এমন মুহূর্তও আসে, যখন এই মনোমালিন্যতার প্রতিউত্তরে মানব আত্মা বে-ইনসাফী আর অন্যায়ের উপর লেলিয়ে ওঠে। এই সকল মুহূর্তে 'আল্লাহ আমাকে দেখছেন' এমন চিন্তা মনে জাগ্রত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি এই সকল মুহূর্তে এমন চিন্তা অন্তরে জাগ্রত না হয়, তাহলে সাধারণত অন্যায় আর জুলুম প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে'।

এরপর আব্দুল হাই আরিফি রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'রাসূল সল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে প্রাকৃতিক ক্রোধ আর রাগ-সাগের আচরণও করেননি। এটা রাসূলের সুন্নাহ। এই সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের প্রচেষ্টায় আমিও স্ত্রীর সঙ্গে ক্রোধ না দেখানোর চেষ্টা করি। আল্লাহর শোকর, আমি বলতে পারবো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে সংসার জীবনের আজ একান্ন বছর চলছে। এই একান্ন বছরে আলহামদুলিল্লাহ আমি কখনো স্ত্রীর সঙ্গে স্বর পরিবর্তন করেও কথা বলিনি'।

পরবর্তীতে আরিফি রহিমাহুল্লাহুর সম্মানিতা স্ত্রীও একবার নিজ থেকে আরিফি সাহেবের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'পুরো জীবনে ডক্টর সাহেব কখনো স্বর পরিবর্তন করে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, এমনটি আমার মনে পড়ে না। তিনি সরাসরি আমাকে নিজের কোনো কাজ করতে বলেছেন, এমনটাও মনে পড়ে না। আমি নিজেই সর্বদা স্বেচ্ছায়, আগ্রহে তার কাজ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকতাম। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে করতে বলতেন না'।

ডক্টর সাহেবের এই কথাগুলো আজ আমার এজন্য স্মরণ এলো যে, গত সপ্তাহে আমি বিবাহের খুতবার মর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম, আনন্দপূর্ণ আর আবেগঘন বৈবাহিক জীবনের জন্য তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আবশ্যক। ডক্টর সাহেবের এই কর্ম সেই তাকওয়ারই ফলাফল। যা পানিতে চলাচল করা আর বাতাসে ওড়ার কারামত থেকে বাস্তবেই হাজার গুণ উচ্চ স্তরের কারামত। এক হাদীসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম'। আব্দুল হাই আরিফি রহিমাহুল্লাহুর উপরোক্ত কাজ রাসূলের এই বর্ণনারই বাস্তব নমূনা।

কুরআনে নিঃসন্দেহে স্বামীদেরকে স্ত্রীদের পরিচালক আর অভিভাবক বলা হয়েছে। কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কর্ম আর বর্ণনা দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অভিভাবক হওয়া দ্বারা এটা উদ্দেশ্য না যে, স্বামী সর্বদা স্ত্রীর উপর নিজের রাজত্ব চালাতে থাকবে, তার সাথে পরিচারিকার মতো আচরণ করবে বা নিজের ক্ষমতা বলে তাকে প্রতি মুহূর্তে নেতৃত্বের চাপে পুঁতে রাখবে। কুরআনেরই অন্য স্থানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালোবাসা আর রহমত, করুনার সম্পর্ক বলা হয়েছে সূরা রুমের সেই ২১ নং আয়াতেই স্ত্রীকে স্বামীর প্রশান্তির উপকরণ ঘোষণা করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক মৌলিকভাবে ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। উভয়ে একে অন্যের প্রশান্তি আর আনন্দের উপকরণ। কিন্তু ইসলামের একটি শিক্ষা হলো, যখনই কোনো সামাজিক কাজ করা হবে, তখনই তাদের জন্য তাদেরই যে কোনো একজনকে নিজেদের আমীর বা পরিচালক বানিয়ে

নেওয়া; যেন সেই কাজটা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়। এমনকি দুই ব্যক্তি যদি কোনো ভ্রমণে বের হয়, তখনও তাদের যে কোনো একজনকে পরিচালক বানিয়ে নেওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে। তারা দু'জন আন্তরিক বন্ধু হলেও এই বিধান। পরিচালক যাকে বানানো হয়েছে এই জন্য বানানো হয়নি যে, সে প্রতিমূহূর্তে অন্যের উপর রাজত্ব করবে। বরং ভ্রমণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্যই একজনকে পরিচালক বানানো হয়েছে। পরিচালকের কাজ হলো, নিজের সাথী-সঙ্গীদের খোঁজখবর রাখা, ভ্রমণের এমন ব্যবস্থাপনা করা, যা প্রত্যেকের আরামের জন্য আবশ্যক. সে এই দায়িত্ব পালন করলে, অন্যদের কাজ হলো তার আনুগত্য করা, তাকে সহযোগিতা করা।

সাধারণ স্বল্প সময়ের একটি ভ্রমণের জন্য যখন ইসলাম এই শিক্ষা দিয়েছে, তখন জীবনের সুদীর্ঘ এক ভ্রমণ ইসলামের এমন শিক্ষা থেকে মুক্ত কীভাবে হতে পারে? তাই, স্বামী আর স্ত্রী যখন থেকে নিজেদের জীবনের যৌথ এই ভ্রমণ শুরু করছে, তখন থেকেই স্বামীকে এই ভ্রমণের আমীর ও পরিচালক বানানো হয়েছে; কারণ এই ভ্রমণের দায়িত্ব পালনের জন্য যেই শারীরিক শক্তি-সক্ষমতা এবং গুণাবলি থাকা উচিত, সৃষ্টিগতভাবেই তা স্বামীর মধ্যে বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিচালনা কেন্দ্রিক এই শিক্ষার জন্য তাদের মৌলিক ভালোবাসা আর আন্তরিকতার সম্পর্কে কোনো ভাটা পড়া ইসলামে সমর্থিত না। দু'জনের কারো জন্যই এই সুযোগ নেই যে, অন্যের সঙ্গে সেবক আর কাজের লোকের মতো আচরণ করবে। স্বামী তার পরিচালনার দায়িত্বের কারণে এটা বুঝতে পারবে না যে, স্ত্রী তার সকল আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। নিজের সকল জায়েয, না জায়েয বাসনা স্ত্রীকে দিয়ে সম্পাদন করার অধিকার সে পেয়েছে বলেও সে ধারণা করতে পারবে না। বরং আল্লাহ তাআলা স্বামীকে সে সক্ষমতা আর গুণাগুণ দিয়েছেন, সেগুলোর দাবী হলো- সে নিজের পরিচালনার দায়িত্ব সঠিকভাবে স্ত্রীর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবে। স্ত্রীর বৈধ চাহিদা সমূহ সাধ্যমতো পূরণ করবে। একইভাবে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাকে যে অধিকার দিয়েছেন, সেগুলোর দাবী হলো, সে

নিজের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহকে নিজের জীবন সঙ্গীকে সহযোগিতা এবং তাকে আনন্দিত করে রাখার ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। যদি উভয়ে এই কাজ করে, তাহলে তাদের সংসার দুনিয়াবী জান্নাত তো হবেই, সাথে তাদের এই জীবন যাপন স্বতন্ত্র ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। এই জন্যই স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিয়ের খুতবায় তাক্বওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্যই ডক্টর আব্দুল হাই রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইহসানের ক্ষেত্র শুধু নামাযই নয়। বরং স্বামী আর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কও ইহসানের ক্ষেত্র।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত থেকে ঐ তিনটি আয়াতকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খুতবার জন্য নির্বাচন করেছেন, এতে অবশ্যই কোনো হেতু আছে। গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে ভাবলে দেখা যাবে, এই তিন আয়াতেই একটি বিষয়ের নির্দেশ খুব স্পষ্ট হয়ে আছে। সেটা হলো, তাক্বওয়ার নির্দেশ। তিনটি আয়াতই তাক্বওয়ার আদেশ দ্বারা শুরু হয়েছে। তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে তোমরা তাক্বওয়া গ্রহণ করো।

কোনো অজ্ঞ বলতে পারে, বিয়ের সঙ্গে তাক্বওয়ার কী সম্পর্ক? কিন্তু যে ব্যক্তি অবস্থার বাস্তবতা বুঝে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যার জানা আছে, বৈবাহিক জীবনের কঠোর বাস্তবতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে যার অভিজ্ঞতা আছে, সে এই চূড়ান্ত ফলাফলে অবশ্যই পৌঁছবে যে, স্বামী আর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা এবং একে অন্যের অধিকার ঠিকভাবে আদায়ের জন্য তাক্বওয়া একটি আবশ্যকীয় শর্ত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাদের একজনের অন্তরে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা আর প্রত্যেকের বাস্তব চিত্র অন্য জনের সামনে এতটা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়, যতটা অন্য কারো সামনে প্রকাশ পেতে পারে না।

একজন মানুষ অন্য মানুষের সামনে নিজের স্বভাবজাত অসৎ অভ্যাস, বাহ্যিক মুচকি হাসির আড়ালে ঢেকে ফেলতে পারে, বাহ্যিক উন্নত চরিত্রের কারুকার্য দিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সাথে দিনরাতের বিভিন্ন

আচরণে বাহ্যিক সেই কারুকার্য অবশিষ্ট থাকতে পারে না। স্বভাবজাত সেই অসৎ অভ্যাস নিজের পোশাকী চাকচিক্য থেকে বের হয়েই যায়। যদি অভ্যন্তরীণ মানবাত্মা তাকওয়ার সাজে সজ্জিত না হয়, তাহলে নিজের জীবন সঙ্গীর যিন্দেগী দুর্বিষহ হয়ে ওঠবে। একজন স্ত্রী স্বীয় স্বামী থেকে যে সকল কষ্ট পেয়ে থাকে, আদালতের সাহায্যে তার সবগুলো সমাধা করা সম্ভব হয় না। আদালত তো দূরের কথা, নিজের কোনো নিকটাত্মীয়কেও বলা যায় না। একইভাবে একজন স্বামীর কাছে স্বীয় স্ত্রীর ব্যাপারে যে সকল অভিযোগ হতে পারে, অনেক সময় স্বামীর কাছে সেগুলোর কোনো সমাধান থাকে না। অন্য কারো মাধ্যমে সেই সমস্যা সমাধান করিয়ে নেওয়ার পথও থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। তাই, স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যকার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ, উভয়ের অন্তরে তাকওয়ার উপস্থিতি। অর্থাৎ সর্বদা উভয়ের মধ্যে এই অনুভূতি থাকা যে, তারা একে অপরের জন্য আমানতস্বরূপ, সেই আমানত রক্ষার জবাব তাদের দিতে হবে আল্লাহর দরবারে।

নিজের জীবনসঙ্গীকে নিজের কোনো আচরণে কষ্ট দিয়ে সে হয়তো দুনিয়ার আদালত থেকে বেঁচে যাবে, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহর সম্মুখে তার দাঁড়াতে হবে। নিজের প্রতিটি আচরণের হিসেব দিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। যতটুকু হক সে নষ্ট করবে, সবটুকুর শাস্তি তার ভুগতে হবে সেদিন। এই অনুভূতি আর ধ্যানের নামই তাকওয়া। এটা এমন ক্ষমতা, নির্জনে থাকা যে ব্যক্তিকে পৃথিবীর কোনো প্রাণী দেখে না, তার অন্তরেও এই অনুভূতি কড়া পাহাড়া বসিয়ে রাখে। একজন পুরুষ আর একজন নারী সঙ্গী হয়ে যখন জীবন যাপন শুরু করবে, তখন যেন এই জীবন ভ্রমণের শুরুতেই তাদের অন্তরে তারা এই অভ্যন্তরীণ প্রহরা বসিয়ে নেয়- সেই ইচ্ছাতেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খুতবায় বারবার তাকওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যেন তাদের সম্পর্ক স্থায়ীত্ব পায়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেন শুধু চাহিদা মেটানোর জন্য না হয়- জীবনের মানবীয় জোশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং তাদের ভালোবাসা আর আন্তরিকতা

যেন তাকওয়ার ছায়ায় পরিপালিত স্থায়ী ভালোবাসার রূপ পরিগ্রহ করে। সেই ভালোবাসা যেন স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র হয়। অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান, অন্যের কল্যাণকামনা আর ইচ্ছাপূরণের দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরপুর হয়। চোখ-মুখ এবং বাহ্যিক পরিপাটি ছাপিয়ে যেন সেই ভালোবাসা অন্তরে নিজের জায়গা করে নেয় দৃঢ়ভাবে। এই সকল আশাতেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খুতবায় এমন তিন আয়াত নির্বাচন করেছেন, যার প্রত্যেকটির সূচনা হয়েছে তাক্বওয়ার সাজ গ্রহণের আদেশ দিয়ে। সেই আয়াত তিনটির মৌলিক নির্দেশনাও এই তাক্বওয়া-ই। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাক্বওয়ার সাজে সজ্জিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

"বিবাহের পর সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু হয়। জীবনের নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়। আশ্চর্যজনক বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। কোনো কোনো অবস্থা অন্তরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়, অন্তর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। আবার কোনো কোনো অবস্থা অন্তরে উল্লাসের প্রবল তরঙ্গ বইয়ে দেয়, বছর বছর বেঁচে থাকার পরম সাধ মনে জাগ্রত করে"।

"...তুমি মাত্রাতিরিক্ত প্রেম দেখাবে না...আবার স্ত্রীকে নিজের ক্রীতদাসী বা ঘরের চাকরানি মনে করে তার সাথে খারাপ আচরণও করবে না। স্ত্রীর অন্তরে নিজের ভয় আর ডর বসিয়ে দেওয়ার জন্য চেহারায় রুক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়ে তার সাথে কথা বলবে না।"

"...ভালোবাসা আর প্রেমের প্রকাশও করতে হবে, নিজের গাম্ভীর্য আর অবস্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আচরণে প্রেমময়তাও প্রকাশ করতে হবে, সাথে নিজের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।"

মাকতাবাতুল আরাফ

দোকান নং : ৫, ২য় তলা, ১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৯৮৮৪৯৯৯৮ facebook.com/maktabatularaf maktabatularaf@gmail.com